মহাজাগরণ

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রকাশক—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্য-ভারতী প্রকাশনী
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৩৬০
প্রচ্ছদপট শিল্পী
শ্রীঅনাথবন্ধু সেন (বুলি)

মুদ্রাকর—
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন, কলিকাতা—৭

মূল্য তিন টাকা

পরম পূজনীয়া

মাতৃদেবী

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী

শ্রীচরণ কমলেষু

"মহাজাগরণ" সন ১৩৫৫ সালে "বর্তমান" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির রচনাকাল ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই উপন্যাসের পটভূমিকা বিয়াল্লিশের বিপ্লব। আজকের দিনে সেই ইতিহাস পুরাতন হলেও ইতিহাস কখনো পুরানো হয় না। যত দিন যায় ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করবার জন্য অতীতের অন্ধকারের গর্ভে ততই সে হয়ে ওঠে উজ্জ্বলতর। বিয়াল্লিশের ইতিহাস জাতির জীবনের বজ্র ঘোষণা। বইটির রচনাকাল এবং প্রকাশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকলেও আজকের দিনে এই বই অনেক নতুন কথার অবতারণা করবে। আমাদের এই বিশ্বাস পাঠক সমাজের সমর্থন পেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

মাঘ ১৩৬০ বিনীত

প্রকাশক

এই লেখকের—

কবিতা :

সুরা ও শোণিত

অশ্রু ও আকাশ

অন্ধকার

উপন্যাস :

রাত্রির যাত্রী

ক্ষণকাল

মহাজাগরণ

এক

শীতের অন্ধকার রাত্রি।

সুখেন্দু আর বিকাশ হোঁচট খেতে খেতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের খোয়া ওঠা রাস্তা দিয়ে চলছিল। দুদিকে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ। কঠিন আর হিমশীতল অন্ধকারে নির্জন শস্যক্ষেত্রের বুকে শিহরণ জাগিয়ে সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছে প্রবল বাতাস।

কাঁপতে কাঁপতে সুখেন্দু বললে, আর কতদূর ?

বিকাশ পিছনে চেয়ে দেখলে। ষ্টেশনের আলো তখনো দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারের অগাধ বিস্তারের মধ্যে মিটমিট করে জ্বলছে যেন নিষ্প্রভ নক্ষত্র। তারা চলে এসেছে অনেকখানি। আরো যেতে হবে।

— এখনো অনেকটা।—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিকাশ বললে।

তার কথা শুনে সুখেন্দু প্রীত হল না। সমস্ত দিন সে আজ পথ চলেছে। গত রাত্রিতে ঘুমোবার অবসর পায়নি। গভীর ক্লান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। কিন্তু ক্লান্ত হলে তার চলবে না। সে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।

—কৃষ্ণা মেয়েটি কি রকম ? সে প্রশ্ন করলে।

—মানে, কি রকম দেখতে ?—বিকাশ বিদ্রূপ করলে কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

—না। আমি জানতে চাইছি যে তাকে বিশ্বাস করা চলে কিনা।

—চলে।—বিকাশের কণ্ঠস্বর রূঢ়।

তার এই রূঢ়তার সঙ্গে সুখেন্দু পরিচিত। সে আর কিছু বললে না। আবার নেমে এল স্তব্ধতা। মাঠের বুকে অন্ধকার উঠলো গভীর

হয়ে। মৃত সর্পের মতো প্রসারিত সেই পথে জীবন যেন সহসা দুর্বহ হয়ে উঠলো।

বিকাশ আর একবার পিছনে চেয়ে দেখলে। ষ্টেশনের আলো আর দেখা গেল না। আপনার মনেই সে বললে, দেড় ক্রোশ পথ এসেছি।

—আর কতোখানি?—সুখেন্দু যেন কথা খুঁজে পেলে।

—বেশী নয়।—বিকাশ বললে।

রাস্তা ছেড়ে এবার তারা নামলো মাঠে। পথ শেষ হয়ে আসছিল বলেই বোধ হয় পথের বাধা দুর্জয় হয়ে উঠলো। মাঠের আল ধরে চলতে চলতে সুখেন্দু কাতরকণ্ঠে বললে, আর পারছি না বিকাশ!

বিকাশ হো হো করে হেসে উঠলো। সেই হাস্যধ্বনি রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতাকে যেন টুকরো টুকরো করে দিলে। তীক্ষ্ণ অথচ মৃদু কণ্ঠে সে বললে, পারছ না? দেশে বিপ্লব আনতে যাচ্ছ, আর পথ চলতে পারছ না?

—চুপ! চুপ!—সুখেন্দু তাকে বাধা দিলে।

বিকাশ হেসে বললে, এত আস্তে কথা কেউ শুনতে পাবে না। জনতার ভীড়ে তারা আমাদের অনুসরণ করে বটে কিন্তু নির্জন স্থানে আমাদের কাছাকাছি থাকতে ভয় পায়।

—তাহলেও সাবধান হয়ে কথা বলা উচিত।—ক্রুদ্ধকণ্ঠে সুখেন্দু বললে।

বিকাশের হাতে টর্চ জ্বলে উঠলো। ঋজু ও দীপ্ত আলোকধারা পথের বহুদূর অবধি উদ্ভাসিত করে তুললে। দুজনেই পিছন ফিরে দাঁড়ালো। যে পথ অতিক্রম করে তারা এসেছে সেই পথ জনহীন। জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই।

—ষ্টেশন পর্যন্ত তারা এসেছিলো।—টর্চ নিভিয়ে বিকাশ বললে, সেখানেই তারা থাকবে, যতক্ষণ না আমরা ফিরি। তারপরে আবার পিছু নেবে।—তার কথায় অসীম ঔদাসীন্য।

—তাদের দেখেছিস ?

—দেখেছি।

—কে কে এসেছে ?

—সেই নাক চ্যাপ্টাটা। তার সঙ্গে আরো একজন আছে। তাকে চিনি না।

তারা চলছিল খানা ডিঙিয়ে ডোবা পার হয়ে। আরো কিছুক্ষণ চলে তারা এসে দাঁড়ালো একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে। আলোর ক্ষীণ রেখা ঘরের ভিতর থেকে পথে এসে পড়ছিল। বিকাশ ডাকলে, কৃষ্ণা ?

কেরোসিনের কুপী হাতে করে একটি তরুণী তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল। সে বললে, এস বিকাশদা।

স্বল্পালোকিত একখানি ঘরে তারা এসে বসলো। বিকাশ বললে, তুমি ঘুমোওনি কৃষ্ণা ?

—না।— কৃষ্ণা বললে।

—খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছ ?

—না, কিছুই এখনো সারা হয়নি।—হাসতে হাসতে কৃষ্ণা বললে, তোমাদের আগে হোক। তার পরে আমি খাব। চা খাবে কি ?

সুখেন্দু চেয়েছিল কৃষ্ণার দিকে। তার কমনীয় দেহের দিকে তাকিয়ে সে যেন কি ভাবছিল। কালো রঙ যে মানুষকে এতখানি মুগ্ধ করতে পারে সে কথা সে জানত না। যৌবনদীপ্ত সুগঠিত তনুকে বেষ্টন করে একটি অপরূপ মহিমা তাকে করে তুলেছিল শ্রীমযী। সুখেন্দুব মনে হচ্ছিল রঙ কালো না হলে কৃষ্ণার এই আশ্চর্য সৌন্দর্য তার চক্ষুব অগোচর থাকত।

চায়ের কথায় সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, যদি আপনার কষ্ট না হয়, তাহলে দয়া করে একটু তৈরী করুন। প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গেছে !

তার কথা বলায় ভঙ্গীতে বিকাশ আর কৃষ্ণা দুজনেই হেসে উঠলো।

বিকাশ বললে, রাত্রি বারোটা বাজে। এখন যদি চা খাস, তো ভাত খাবি কখন?

—না খেতেও রাজি আছি।—সুখেন্দু বললে।

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে চায়ের জল গরম করতে গেল।

বিকাশ তার এ্যাটাচিকেস খুলে কয়েকখানা কাগজ বার করলে। তারপর অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে সেগুলি পড়তে আরম্ভ করলে।

কৃষ্ণা চা করে নিয়ে এল।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিকাশ বললে, ধন্যবাদ দোব না কৃষ্ণা. কিন্তু তুমি না থাকলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠত।

লজ্জিত কণ্ঠে কৃষ্ণা কি বললে ঠিক বোঝা গেল না।

সুখেন্দু চা খেয়ে মাদুরে শুয়ে পড়েছিল। কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বিকাশ বললে, রাতটা কি তুই শুয়েই কাটাবি নাকি? কাজগুলো করবে কে?

—তুই।—ক্লান্তকণ্ঠে সুখেন্দু বললে।

বিকাশ আর কিছু বললে না। অ্যাটাচিকেসের ভিতর থেকে একখানা চিঠির প্যাড বার করে লিখতে আরম্ভ করলে।

কৃষ্ণা কয়েকবার দরজার কাছে এসে ফিরে গেল। বিকাশ গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে। সে সাহস করে তাকে খেতে আসবার জন্য ডাকতে পারলে না। সে যখন কাজ করে তখন তাকে বিরক্ত করতে কৃষ্ণার ভয় হয়। তার গাম্ভীর্য সমগ্র পরিবেশকে প্রভাবিত করে তোলে। শুধু কাজ করবার সময় নয়, সে যখন গম্ভীর হয়ে ওঠে, তখন মানুষের সান্নিধ্য থেকে এত দূরে সরে যায় যে সেখানে তাকে স্পর্শ করা চলে না। সে কখনো স্বল্পভাষী আবার কখনো সহজ। কোন সময় স্পষ্ট ও প্রখর হয়ে ওঠে তার একাকিত্ব। কোন সময় সে শিশুর মতো চপল ও চঞ্চল।

রাত্রি গভীর। হিম-জর্জরিত অন্ধকার আকাশে মেলেছে কালো ও কঠিন পাখা। অটল স্তব্ধতা রহস্যাবৃত মৃত্যুপুরীর অনুদ্ঘাটিত বিচিত্র তথ্যের ওপর টেনে দিয়েছে সুদৃঢ় আবরণ। সুখেন্দু শুয়ে আছে। ঘরের বাইরে, দাওয়ার এককোণে কৃষ্ণা জড়োসড়ো হয়ে বসে। ঘুমে তার চোখ ভারী হয়ে উঠছে।

কতোক্ষণ পরে সে শুনতে পেলে বিকাশ ডাকছে, কৃষ্ণা!

তাড়াতাড়ি সে ভিতরে গেল। বিকাশ বললে, কই, খেতে দাও? খুব কষ্ট দিলুম, না?

—তোমাদেরই খেতে কষ্ট হবে। ভাত এতক্ষণে কন্‌কন্‌ করছে।—কৃষ্ণা বললে।

বিকাশ উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো, কবে যে গরম ভাত খেয়েছি সে কথা মনেই পড়ে না।

—আমারও।—আলস্য জড়িত কণ্ঠে সুখেন্দু বললে।

বিকাশের ব্যবহারের সঙ্গে কৃষ্ণার পরিচয় আছে। কখনো সে আসে সংবাদ দিয়ে, আবার কখনো আবির্ভূত হয় অকস্মাৎ। তার আকস্মিক আবির্ভাবই কৃষ্ণাকে বিপন্ন করে তোলে। আজ অবশ্য তার আসার কথা সে জানত।

বিকাশের অত্যাচারও তাকে কম সহ্য করতে হয় না। এখানে এসে রাত্রিটা সে কাজ করেই কাটায়। সঙ্গে কেউ থাকলে তার সঙ্গে নানা পরামর্শ করে। কৃষ্ণার অসুবিধার আর অন্ত থাকে না। কিন্তু সেই অসুবিধা তাকে পরিতৃপ্ত করে।

তার চোখে বিকাশ এক রহস্যময় মানুষ। তার ঘর নেই, সংসার নেই, আজ এ-গ্রামে কাল ও-গ্রামে এই করে তার দিন কাটে। পায়ে হেঁটে সে ঘোরে দূর থেকে দূরান্তর।

দীর্ঘ ও সুগঠিত দেহ, রুক্ষ ও অবিন্যস্ত চুল, গৌরবর্ণ বিকাশকে দেখলে তার রাজার ছেলে বলে মনে হয়। এই রাজপুত্র লক্ষ্মীছাড়ার মতো পথে পথে ঘু্র বেড়ায় কেন. সে প্রশ্নও তার মনে জাগে।

বিকাশকে সে শ্রদ্ধা করে।

চরম অপমান আর দুর্গতি থেকে সে তাকে বাঁচিয়েছে। আত্মসম্মান বজায় রেখে সে যে এখনো দিনযাপন করছে সে শুধু তার জন্য।

সেই ভয়ঙ্কর কথা মনে পড়লে কৃষ্ণার গায়ে এখনো কাঁটা দেয়। অন্তরাত্মা আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

চব্বিশ পরগণা জেলার একটি গ্রামে তার বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামীর একটি ছোট দোকান ছিল। সেই দোকানের আয় থেকে চলত তাদের দিন।

এক রাত্রিতে সেই দোকানে হঠাৎ আগুন লাগলো। বাড়ীর কাছেই দোকান। সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে করতে তার স্বামী দোকানের দিকে ছুটলো। ভয়বিহ্বল কৃষ্ণা উৎকণ্ঠিত চিত্তে এসে দাঁড়ালো বাড়ীর উঠানে। রাত্রি গভীর। সেই সময় কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল সে কিছু বুঝতে পারলে না। পিছন থেকে কে তার মুখ চেপে ধরলে অতর্কিতে। তারপর তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বাঁধলে তার হাত, পা আর মুখ। সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল তখন সে নৌকার ছইয়ের মধ্যে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় পড়ে। নৌকা চলছে দুলতে দুলতে।

তার পাশেই যে বসেছিল তাকে দেখে সে ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলো। তার মাসতুতো দেওর লক্ষ্মণ! কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে কাতর কণ্ঠে সে বললে, লক্ষ্মণ ঠাকুরপো, তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে?

লক্ষ্মণ গাঁজা খাচ্ছিল। আরক্তিম চোখে সে একখানা লম্বা ছোরা বার করে বললে, চুপ করে থাক্! কথা কইবি তো-এই ছোরা তোর বুকে বসিয়ে দোব।

ছোরাখানা আন্দোলিত করতে করতে সে নিয়ে এল কৃষ্ণার বুকের কাছে। কৃষ্ণা ভয়ে চোখ বুজলে।

বহুক্ষণ পরে কৃষ্ণা অনুমান করলে নৌকা ঘাটে ভিড়েছে।

তাকে আর একবার শাসিয়ে লক্ষ্মণ নৌকা থেকে নেমে গেল। দাঁড়ী-মাঝিরাও তার সঙ্গে গেল। কৃষ্ণা বুঝতে পারলে তারা আশ্রয়স্থল ঠিক করবার জন্য যাচ্ছে। যেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে তুলবে। হাত পা'র বাঁধন খোলবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না। তার বুকের ভিতর কি রকম করছিল। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছিল জল। কোনরকমে মুখের বাঁধন সরিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো আর্তকণ্ঠে।

কাছাকাছি আর একখানা নৌকা ছিলো। সেই নৌকায় ছিলো বিকাশ।

চীৎকার শুনে সে কৃষ্ণার নৌকায় লাফিয়ে পড়লো। একজন মাত্র লোক পাহারায় ছিলো। তাকে পর্যুদস্ত করা বিকাশের পক্ষে কঠিন হলো না।

সেই ভীষণ বিপদ থেকে বিকাশ তাকে উদ্ধার করে।

তারপর থেকেই বিকাশ তার অবলম্বন।

তার স্বামী যাতে তাকে নিয়ে ঘর সংসার করে বিকাশ প্রথমে সেই চেষ্টাই করেছিল। সে কৃষ্ণাকে নিয়ে গেল চব্বিশ পরগণায়। দুঃখমোচন কিন্তু তার প্রস্তাবে রাজী হল না। বললে, যে পরিবার বেরিয়ে গেছে তাকে নিয়ে আবার ঘর করব কি?

তার কথা শুনে বিকাশ হেসে উঠলো। কৃষ্ণা কাঁদলে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

বিকাশ তাকে নিয়ে এল মেদিনীপুরে। তার আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করলে। গোপালনগরের ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরে কৃষ্ণা নতুন করে বাঁধলে বাসা।

বিকাশ ধীরে ধীরে কৃষ্ণাকে তৈরী করে নিচ্ছে। কৃষ্ণা সেকথা

বুঝতে পারে। প্রথম প্রথম সে তার নিজস্ব বিষয় বিকাশকে হস্তক্ষেপ করতে দিত না। কিন্তু বিকাশের প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে তার দুর্বল প্রতিবাদ কোন কাজে আসেনি। তার চেষ্টায় সে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। তার দেওয়া বইও কিছু কিছু পড়েছে। এখন তার বই পড়তে ভাল লাগে। সে নিজেই বই চেয়ে নিয়ে পড়ে।

অবকাশ পেলে বিকাশ মুখেও তাকে অনেক কিছু বলে। বই পড়ার চেয়েও তার ভালো লাগে বিকাশের মুখের কথা। যেমন অপূর্ব বলার ভঙ্গী, তেমনি বোঝাবার অনন্যসাধারণ শক্তি। বিকাশ তাকে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

সে তার চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এক নতুন জগতের আবরণ।

তার কথা শুনতে শুনতে কৃষ্ণার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বিশাল ও বিচিত্র পৃথিবী, সেই পৃথিবীর অন্তর্গত বহু দেশ, তার অধিবাসী বিভিন্ন জাতি, তাদের দেশের ও জীবনের বহু জটিল সমস্যা। সে শোনে মানুষ মানুষকে শাসন করছে, শোষণ করছে, নিষ্পেষিত করছে। শাসিত, শোষিত ও নিষ্পেষিত মানুষ চেষ্টা করছে প্রাণপণে সংস্কারের ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার জন্য। মানুষ মানুষকে রেখেছে বঞ্চিত করে আর বঞ্চিতেরা দাবী করছে স্বাধিকার।

বিকাশের সব কথা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু যেটুকু বুঝতে পারে সেইটুকুই তার মনে জাগায় আলোড়ন আর বিকাশ তার চোখে উঠে যায় আরো উঁচুতে।

দুই

গোপালনগরের সেই ছোট কুঁড়ে ঘরে কৃষ্ণা বাস করত তার দাতু গোবর্ধনের সঙ্গে। আপন দাতু নয়। অবশ্য সে খবর গ্রামের লোক জানত না। কৃষ্ণাকে দূরসম্পর্কের নাতনী বলে গোবর্ধন তাদের কাছে পরিচয় দিয়েছিল।

গোবর্ধনই সেই কুঁড়ে ঘরের মালিক। বহুদিন সে বিকাশের বাড়ীর সরকার ছিলো। লোকটি বিশ্বাসী এবং কঠিন প্রকৃতির। তার আশ্রয়েই বিকাশ কৃষ্ণাকে রেখেছিল।

গোবর্ধনের বয়স হয়েছে।

শৈশবে বিকাশকে সে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। সে তাকে স্নেহ করত। তা ছাড়া নিয়মিত সাহায্যও সে পেত তার কাছ থেকে। বিকাশের মানসিক গঠন সম্বন্ধে তার মনের কোনখানে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিলো। সে তাকে বিশ্বাস করত।

গোপালনগর ছোট একটি পল্লীগ্রাম। অবাধ উন্মুক্তি গোপালনগরের একটা বৈশিষ্ট। যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই শুধু মাঠ। সেই মাঠের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে বাতাস বয়ে যায়। বাংলাদেশের অন্যান্য পল্লীগ্রামের মতো এখানে ম্যালেরিয়া নেই। স্থানটি স্বাস্থকর।

গোপালনগরের জীবনধারা প্রবাহিত হয় বৈচিত্রহীনতার ভিতর দিয়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য পল্লীর সঙ্গে তার মিল আছে। অজ্ঞতা, অশিক্ষা আর কুসংস্কার নিয়ন্ত্রিত করে পল্লী-জীবন। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও বিদ্বেষ বিষাক্ত করে রেখেছে মানুষের মন। বাধাহীন

উন্মুক্তির পটভূমিকায় পঙ্কিল আবর্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ স্রোতে বিক্ষুব্ধ আলোড়নের সৃষ্টি করে।

সারা গ্রামখানিতে মাত্র দশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস। বাকী সব মাহিষ্য। কৃষিকার্য তাদের জীবিকার্জনের অবলম্বন। গ্রামে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই একঘরে। অর্থাৎ সেই দশ ঘরের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের বিরোধ আছে। কোন বাড়ীতে কারো যাতায়াত নেই। ক্রিয়াকর্মেও কেউ কাকেও নিমন্ত্রণ করেন না। যে যার নিজের আত্মীয় ও বন্ধুদের আহ্বান করে আনেন বাইরে থেকে। মাহিষ্যরা অবশ্য সব বাড়ীতেই যায়। বামুনবাড়ীর প্রসাদের ওপর তাদের লোভ অপরিসীম।

এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই দশটি ঘর, যাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন, তাঁরা আজ বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত। তাঁরা এমনি স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণচেতা হয়ে উঠেছেন যে মনের স্বচ্ছতা অবধি তাঁদের অবশিষ্ট নেই। এ-বাড়ীর ছেলে উন্নতি করছে শুনলে ও বাড়ীর কর্তার মুখ অন্ধকার হয়ে ওঠে। ও-বাড়ীর ছেলের মাইনে বাড়বার খবর শুনলে এ-বাড়ীর সকলে ক্ষুণ্ণ হন।

প্রত্যেক বাড়ীতেই গৃহদেবতা আছেন। নিষ্ঠাসহকারে প্রতি বাড়ীর কর্তাই যথারীতি দেবতার পূজা ও অর্চনা করেন। ফুল ও তুলসীতে দেবতাকে ঢেকে দেওয়া হয়। মন্ত্রের গম্ভীর ধ্বনি ধূপ ও ধূনার ধোঁয়ার অন্ধকারে রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। গো ব্রাহ্মণ আর জগতের হিতের জন্য তাঁরা প্রার্থনা করেন কিন্তু সেই পবিত্র প্রার্থনা তাঁদের অপবিত্র মনকে উন্নত করতে পারেনি।

বিরোধ মাহিষ্যদের মধ্যেও আছে কিন্তু সে বিরোধ চিরস্থায়ী হয় না। তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হয়, মারামারি হয়, মামলা বাধে, আবার সব মিটেও যায়। ব্রাহ্মণদের মতো তারা বিরোধের পাকা পাঁচীল তুলে বাস করে না।

কালাচাঁদ মুখুয্যের প্রভাব প্রতিপত্তি গোপালনগরে খুব বেশী। তাঁর অর্থ ও সামর্থ দুইই আছে। একটি মাত্র ছেলে তাঁর। সে কোলকাতায় চাকরী করে। তা ছাড়া তাঁর প্রচুর ধানজমিও আছে। বাড়ীর ভিতরে দশটা ধানের মরাই। আরো নানা ফন্দি-ফিকিরে তিনি বেশ কিছু উপার্জন করেন।

বিকাশ আর সুখেন্দু যে রাত্রিতে এসেছিল গোবর্ধন সেই রাত্রিতে কালাচাঁদের বাড়ীতে ছিল।

জ্ঞাতি দাসু মুখুয্যের সঙ্গে কালাচাঁদের বিরোধ প্রবল হয়ে উঠছে। দাসুর নামে তিনি আদালতে মামলা রুজু করেছিলেন। গোবর্ধন তার প্রধান সাক্ষী। পরের দিন মামলার দিন পড়েছে। কোর্টে গিয়ে কি বলতে হবে গোবর্ধন তার তালিম নিতে এসেছিল।

হাড় কাঁপানো শীতে একবার দাসপাড়া থেকে বামুনপাড়ায় এলে রাত্রিতে ফেরা সম্ভব হয না। তাছাডা বামুনবাড়ী খাওয়া দাওয়াও ভালো হয়। সুতরাং বেশী খাওয়াও হয়ে যায়। রাস্তা অনেকখানি। বুড়ো বয়সে এই শীতে এতখানি পথ হাঁটার কষ্ট স্বীকার করতে গোবর্ধন রাজী নয়।

সে ফিরছিল ভোরবেলা।

বামুনপাড়া পেরিয়ে মাঠে নামতেই তার দেখা হল রতনের সঙ্গে। রতন পুলিশ থানার জমাদার।

—খুড়ো কোথা গিছলে গো এত সকালে ?—রতন বললে।

—কালো বামুনের বাড়ী।—গোবর্ধন উত্তর দিলে।

—ও, তুমি যে মামলার সাক্ষী।—মুচকে হাসলে রতন।

তার হাসি গোবর্ধনের ভালো লাগলো না। সে উষ্ণ কণ্ঠে বললে, হাসলে যে ? সাক্ষী তো হয়েছে কি ?

—না, হয়নি কিছু।—রতন বললে, পরের মামলায় সাক্ষী দিয়ে

বেড়াচ্ছো, আর নিজের ঘরেই যে মামলা বাঁধবার যোগাড় হচ্ছে। সে খবর কিছু রাখো ?

গোবর্ধন বিস্মিত হল। নিজের ঘরে মামলা ? কথাটা যেন হেঁয়ালির মতো। সে বললে, খুলে বল রতন, কি বলছ।

—সব কথা খুলে বলা ভালো নয় খুড়ো ! বিশেষ করে এসব গোপন কথা। তবু তুমি বলেই বলি। বিকাশবাবুকে সাবধান করে দিও। তার পেছনে টিকটিকি লেগেছে। কোলকাতা থেকে এসে তারা কাল থানায় সারারাত ছিলো, আজ সকালে বিকাশবাবুর পাত্তা না পেয়ে ফিরে গেছে।

—বিকাশ এসেছিল ?—গোবর্ধন বললে।

—তুমি জান না ?

—না, আমি বাড়ীতে ছিলুম না।

রতন একবার মুচকে হাসলে। তারপর বললে, তোমার কথা টিকটিকি শুনবে কিন্তু আমি শুনব না। বিকাশবাবু সত্যিই এসেছিল। তার সঙ্গে আর একজন ছিলো। তার নামে হুলিয়া আছে। ভোরের দিকে তোমার বাড়ীতে কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও, তোমার কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারব না খুড়ো।

—তুমি আমায় জেরা করছ রতন ?—গোবর্ধন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

রতন তেমনি ভাবেই হেসে বললে, না না, জেরা করব কেন ? সে যারা করবার তারা করবে। আমি তোমায় হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি। খুড়ো বলে ডাকি, আর আমি এই গ্রামেরই লোক ! তোমার কাছে অনেক উপকারও পেয়েছি। ওবেলা তুমি একবার থানায় যেও ! বড়বাবু তোমায় ডেকেছে।

চলতে চলতে গোবর্ধনকে এবার থমকে দাঁড়াতে হল। রতন এতগুলো কথা বললে বটে, কিন্তু হেঁয়ালি এখনো পরিষ্কার হল না।

তার কথার মর্ম গ্রহণ করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে সে বললে, বড়বাবু ডেকেছে কেন?

—গেলেই শুনতে পাবে। কেন ডেকেছে আমি কি করে জানব?—রতন বললে।

গোবর্ধনের মেজাজ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু সমস্ত ঘটনা না জেনে রতনের সঙ্গে তর্ক করা সে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করলে না। সে বললে, আচ্ছা আমি যাব। তবে আদালত থেকে যদি ফিরতে দেরী হয় তো একটু রাত হবে।

বাড়ী ফিরেই সে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করলে, কাল বিকাশ এসেছিল?

—এসেছিল।—কৃষ্ণা উত্তর দিলে।

—কখন গেছে?

—রাত তখন তিনটে হবে।

—এর মানে কি? —হঠাৎ গোবর্ধনের কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। সে বললে, আমি এসব পছন্দ করি না। গাঁয়ের লোকেই বা বলবে কি? আমাদের তো সমাজে বাস করতে হয়? যখন তখন সে আসবে, কখনো একজন কখনো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে। তারা কি ধরণের লোক তাও জানবার উপায় নেই। তাদের কাকেও পুলিশ খুঁজছে, কেউ ফেরারী। এই বুড়ো বয়সে আমি কি তাদের জন্য জেল খাটতে যাবো?

গম্ভীর মুখে কৃষ্ণা বললে, চীৎকার করছ কেন দাদু?

—করছি সাধ করে?—মুখভঙ্গী করে গোবর্ধন বললে, বড়বাবু আমাকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছে।

—থানায় ডেকেছে?—কৃষ্ণার মুখে উদ্বেগের রেখা ফুটে উঠলো।

—হ্যাঁ।—গোবর্ধন বললে, বিকাশের সঙ্গে যে এসেছিল তার নামে নাকি হুলিয়া আছে। রতন বলছিল, পুলিশের লোক নাকি তাকে এখানেও খুঁজতে এসেছিল।

—এসেছিল একজন।—কৃষ্ণা বললে, এখন বুঝতে পারছি যে সে পুলিশের লোক। তখন কিন্তু বিকাশদা'র বন্ধু বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল।

—কি বললি তুই তাকে ?

—কেউ আসেনি, এই কথাই বলেছি।—নিম্নকণ্ঠে কৃষ্ণা বললে।

গোবর্ধনের চিত্তের উত্তাপ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছিল। কৃষ্ণার কথায় সে এবার হেসে ফেললে, ওকথা বললি কেন ?

—কেউ খুঁজলে ওই কথা বলতেই বিকাশদা বলে দিয়েছিল।

কৃষ্ণার গম্ভীর মুখের দিকে গোবর্ধন একবার চেয়ে দেখলে। তার চীৎকার শুনে হয়তো সে কিছু মনে করেছে। থানায় যাওয়ার সংবাদ পাওয়া অবধি তার মন এমনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল যে সামান্য কারণেই সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। যে কথাগুলো সে বলেছে সেগুলো খুব ভালো কথা নয়।

তামাক সাজতে সাজতে আপন মনে সে বললে কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গীতে, আমার যে রাগ হলে জ্ঞান থাকে না। রত্না মাথাটা এমনি গরম করে দিলে যে কতকগুলো যা তা বলে ফেললুম।

কৃষ্ণা তার কথার কোন উত্তর দিলে না।

কিছুক্ষণ অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে স্নান সেরে গোবর্ধন যখন খেতে বসলো তখন সে রীতিমতো অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণার গাম্ভীর্য তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। গলাটা সাফ করে নিয়ে সে বললে, তুই কিছু মনে করিসনি কৃষ্ণা, আর বিকাশকে যেন কিছু বলিস নি। রত্না জমাদারটা বড় পাজী! সে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল।

কৃষ্ণা এবার কথা কইলে। বললে, আমি তোমার আশ্রয়ে বাস করি দাদু, আমাকে তুমি যা ইচ্ছা বলতে পারো। কিন্তু বিকাশদা'কে তুমি

ওইসব বললে কি করে? সে আর তার বন্ধুরা কি ধরণের লোক সেকথা কি তুমি জান না?

কুণ্ঠিতকণ্ঠে গোবর্ধন বললে, আজ সকালবেলাই মাথা খারাপ করলুম, সারাদিন কেমন করে কাটবে কে জানে? আদালত থেকে ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারলে হয়।

কৃষ্ণার সামনে থেকে সে সরে গেল। তার রাগ চট করে পড়ে না সেকথা সে জানে। কোনদিন সকালবেলা রাগারাগি হলে, পরদিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত তার মুখে হাসি ফোটে না।

গোবর্ধন আবার এক বাড়ীতে বাস করে কারো মুখ ভার করে থাকা সহ্য করতে পারে না। আদালতে যাওযার জন্য তৈরী হযে সে বেরিয়ে পড়লো। যাওয়ার সময় কৃষ্ণার উদ্দেশে বলে গেল, ওবেলা সেরটাক দুধ আলাদা করে রেখে দিস বড়বাবুর জন্যে। আমি ফেরবার সময় নতুন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আসব।

মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণা বললে, আচ্ছা।

দুর্গা নাম জপ করতে করতে গোবর্ধন চলে গেল। বাইরের ঝাঁপ বন্ধ করে এসে কৃষ্ণা ঢুকলো রান্নাঘরে। জ্বলন্ত উনুনের ঠিক ওপরে, মাচায় রাশীকৃত ঘুঁটের ভিতর থেকে একটা চিঠির বাণ্ডিল সে বার করলে। বাণ্ডিলটা উলটে-পালটে একবার দেখে আবার সেটা ঘুঁটের স্তূপের মধ্যেই ঢুকিযে দিলে।

পিঁড়ের ওপর যখন সে চেপে বসলো তখন তার ললাটে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তিন

অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগ উঠেছে বেড়ে। কনকনে বাতাস সুতীক্ষ্ণ সূচীমুখের মতো বিঁধছে প্রকৃতির সর্বাঙ্গে। পথ নির্জন। দরিদ্র গ্রামবাসীরা হিমের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ সমান উঁচু মাটির দাওয়ার ওপর বসেছে চেপে। হিমকে প্রতিরোধ করছে চটের পর্দা। অশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনি প্রকৃতির স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে, আর মাঝে মাঝে কুকুর ডাকছে।

কৃষ্ণা রান্নাঘরে ছিলো। বাইরে গোবর্ধনের নাম ধরে কে ডাকতে সে বেরিয়ে এসে ঝাঁপ খুলে দিলে। সাইকেল নিয়ে গৌরীকান্ত ঢুকলো ভিতরে। জিজ্ঞাসা করলে, গোবর্ধন কোথা?

—থানায় গেছে।—মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণা উত্তর দিলে।

—কেন?—গৌরীকান্ত বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

—বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে একবার এদিক-ওদিক চেয়ে কণ্ঠস্বর নামিয়ে গৌরীকান্ত বললে, কোন গোলমাল হয়নি তো?

—হয়নি, তবে হতেও পারে।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে গৌরীকান্ত বললে, কি ব্যাপার সব আমায় খুলে বল কৃষ্ণা?

—সব আমি নিজেই জানি না।—কৃষ্ণা বললে, বিকাশদা'র সঙ্গে কাল একজন এসেছিল। তাকে নাকি পুলিশ খুঁজছে।

—কথাটা তাহলে জানাজানি হয়ে গেছে?

—পুলিশ জানতে পেরেছে, সেইজন্যই দাদুকে ডেকে পাঠিয়েছে।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটলো। তারপর গৌরীকান্ত বললে, আর কিছু খবর আছে?

—আছে। আমি আসছি।

কৃষ্ণা লঘুপদে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। পরক্ষণে সে চিঠির বাণ্ডিলটি কাপড়ের মধ্যে ঢেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বাণ্ডিলটা গৌরীকান্তের হাতে দিয়ে সে বললে, বিকাশদা দিয়ে গেছে। তুমি আর দাঁড়িয়ো'না। কি জানি, যদি বাড়ীর ওপর পুলিশের নজর থাকে?

সাইকেল নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো গৌরীকান্ত।

সমস্ত দিন উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়ে কৃষ্ণা এতক্ষণ পরে অনুভব করলে স্বস্তি। চিঠির বাণ্ডিলটি গুরুভার বোঝার মতো তার বুকের ওপর চেপেছিল সারাদিন। দারুণ অস্বস্তির মধ্যে কেটেছে তার সময়। আরো বহুবার তাকে সংবাদবাহিকার কাজ করতে হয়েছে কিন্তু সে কাজ আর কখনো এতখানি কঠিন বলে তার মনে হয়নি।

এখনো সে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। গোবর্ধন থানা থেকে না ফেরা পর্যন্ত তার উদ্বেগের অবসান হবে না।

একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শীতে হি হি করতে করতে গোবর্ধন এল। কৃষ্ণার মনে তখন অজস্র প্রশ্ন। কিন্তু তাকে একটি কথাও বলতে হল না। গোবর্ধন নিজেই বললে, ব্যাপার বড়ো গোলমেলে।

তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। শীতে ও আতঙ্কে গলা যেন বুজে আসছে। সে যে ভয় পেয়েছে সেকথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে।

ক্লান্তকণ্ঠে গোবর্ধন বললে, বিকাশের সঙ্গে যে এসেছিল সে আর কখনো এখানে আসেনি, না?

—না।—কৃষ্ণা বললে।

—সত্যিই তার নামে হুলিয়া আছে।

কৃষ্ণার বিশাল চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

গোবর্ধন বলতে লাগলো, বড়বাবু তো রেগেই আগুন। নতুন গুড়ের সন্দেশ এই ফেলে দেয় তো এই ফেলে দেয়! থানায় গিয়ে ঢুকতেই আমাকে হাজতে বন্ধ করলে।

—হাজতে? —অকস্মাৎ সহানুভূতিতে কৃষ্ণার কণ্ঠ স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। বিনা দোষে এই লোকটি যে লাঞ্ছনা সহ্য করে এল সে কথা ভেবে সে আর স্থির হয়ে থাকতে পারলে না।

গোবর্ধন বলছিল, সেপাই ডেকে হাতে হাতকড়ি পরাবার হুকুমও দিয়েছিল। ভাগ্যিস কালোবামুন সেখানে ছিল। নাহলে আজ রাতটা কি করে কাটত কে জানে?

—কালোবামুন সেখানে কি করতে গিছল?—কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে।

—কি জানি!—গোবর্ধন মুখভঙ্গী করলে, বড়বাবুর সঙ্গে ফিস্‌ফাস করে অনেক কথা হচ্ছিল শুনলুম। কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু দু'তিনবার বিকাশের নাম শুনতে পেয়েছি।

—বিকাশদা'র নাম?

—হ্যাঁ।—গোবর্ধন আবার মুখভঙ্গী করে বললে, রকম-সকম ভালো বোধ হচ্ছে না।

কৃষ্ণা চিন্তা করতে লাগলো।

গোবর্ধন বললে, কালোবামুন নিজের গরজেই আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি যে তার মামলার সাক্ষী। কাল রাতে আমি তার বাড়ীতে ছিলুম এই সত্যি কথাটা তার মুখ দিয়েই বেরোল। বড়বাবু তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। বলে, 'কোঁৎকার চোটে আমি ওর পেট থেকে কথা বার করব! ও সমস্ত জানে।' কালোবামুন অনেক বুঝিয়ে তবে বড়বাবুকে ঠাণ্ডা করে।

সমস্ত ঘটনাটাই কৃষ্ণার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো।

গোবর্ধন বললে, শেষটা বড়বাবু বললে, 'যা, আজ তুই বেঁচে গেলি। কালোবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুই ওঁর সঙ্গে দেখা করিস।'

—তুমি কি বললে?

—বললুম, যে আজ্ঞে। কালোবামুন আমায় কাল যেতে বলে দিয়েছে।

প্রকৃতির স্তব্ধতা হয়ে উঠলো অসহনীয় আর অস্বাভাবিক। ঝিল্লীধ্বনিও থেমে গেল। শুধু তীব্র হয়ে উঠলো শীত।

কৃষ্ণা আর গোবর্ধন দুজনেই অস্বস্তিবোধ কবতে লাগলো।

গোপালনগরে বিকাশ কোথা থেকে এল এবং কেন এল কালাচাঁদ তার কোন হেতু খুঁজে পাননি। রাজপথ দিয়ে এলেও আগমনবার্তা -ঘোষণা করে সে আসেনি। আরো অনেক মানুষের মতো সে এসেছিল কোন পরিচয়পত্র না নিয়ে। অনাহূত পথিকের মতো এসে সে নিঃশব্দে মিশে গেল ভীড়ের মধ্যে। যখন তার স্বাতন্ত্র মানুষের দৃষ্টিকোণে আবিষ্কৃত হল, গোপালনগরে তখন তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হযেছে।

তার সম্বন্ধে অনেক কথাই কালাচাঁদের কানে এসেছিল। সে হঠাৎ আসে আর হঠাৎ চলে যায়। কখনো এসে দু'তিন দিন থাকে আবার কখনো শোনা যায় রাত্রির অন্ধকারে এসে সে রাত্রির অন্ধকারেই চলে গেছে। তার আসা-যাওয়ার মধ্যে কোন নিয়ম নেই। কোন প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যই যেন তার এইভাবে যাতায়াত। পশ্চাতে সদাজাগ্রত পুলিশের গুপ্তচর নিয়ে সে আরো কোন কোন স্থানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে বেড়াচ্ছে কে জানে? পুলিশ বিভাগে তার জন্য সতর্কতার অন্ত নেই।

বিকাশ নিজেই তো ক'বার জেল খেটেছে।

তামাক সাজতে সাজতে গোবর্ধন বললে, জানিস কৃষ্ণা, কালোবামুন আমাকে এমনি বোকা ঠাউরেচে যে আমি গিয়ে তাকে ঘরের কথা বলে আসব।

কৃষ্ণা যেন গোবর্ধনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিশাল চোখ দুটো মেলে সে বললে, কিছু বলোনি তো দাদু?

—পাগল হয়েছিস তুই, না তুইও আমায় বোকা ভাবিস? বিকাশকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি সেকথা তোকে বলিনি?—গোবর্ধনের চোখ দুটো কোটরের ভিতর থেকে জ্বল-জ্বল করে উঠলো।

কৃষ্ণা আর কিছু বললে না। গোবর্ধন তার দিকে চেয়ে রইলো।

সে যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে দেখা দিয়েছে এক বিচিত্র পরিবর্তন। সে আজকাল কম কথা কয়। এত কম কথা আর কখনো কইত না। তার ললাটে চিন্তার রেখা। মুখে অনমনীয় কাঠিন্য। ঋজু ও সুগঠিত তনুর ভিতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কৃচ্ছ্রসাধনার পরিচয়। তার নিকষ কালো রূপ দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

তাকে দেখে গোবর্ধনের যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণা বললে, তুমি কালোবামুনকে কি বললে?

—বলেছি, কাল সব কথার জবাব দোব।

কৃষ্ণা আর কিছু বললে না। অন্ধকারের দিকে সে তাকিয়ে রইলো শূন্যদৃষ্টিতে। তার নিজেকে নিঃসঙ্গ আর অসহায় বলে মনে হতে লাগলো। তার চিত্ত মথিত করে তুলছিলো একটা সুতীব্র অস্বস্তিবোধ। এই অস্বস্তি-বোধ কিছুদিন হল তার মধ্যে জেগে উঠেছে। একটা দুরন্ত পিপাসায় তার কণ্ঠ অবধি উঠছে শুকিয়ে।

চার

তার পরদিন গোবর্ধন কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি করি বল দেখি? কালোবামুনকে আজ উত্তর দিতে হবে।

—কি আবার করবে? —মৃদু কণ্ঠে কৃষ্ণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, স্পষ্ট জবাব দিয়ে এসো। এর পরে যেন আর সে ওরকম কথা বলতে সাহস না করে।

গোবর্ধনের নিজের ইচ্ছাও তাই। তবুও তার বুকের ভিতর যেন একবার ঢিবঢিব করে উঠলো। হঠাৎ সে যেন এমন একটা পথে পদক্ষেপ করছে যে পথ শুধু দুর্গম নয়, যেখানে পদক্ষেপ করতে পথিক বারংবার পথভ্রান্ত হয়। সে বললে, তারপর?

—তারপর যা হবে তার জন্যে তৈরী হও দাদু। —কৃষ্ণা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো। বললে, এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি?

—সত্যি।—গোবর্ধন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

তার মনে হয় সে বেশ শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। জীবনে তার কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিলো না। অতৃপ্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। কিন্তু এই অনাহূত অশান্তি কোথা থেকে এল? উদ্বিগ্ন মন নিয়ে সে বারংবার একই কথা চিন্তা করতে লাগলো, আর একটা নিষ্ফল ক্রোধে দগ্ধ হতে লাগলো ভিতরে ভিতরে।

কৃষ্ণার চিত্তও অশান্ত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সে অশান্তি ভিন্ন প্রকৃতির। অতৃপ্তির দাব-দাহ তার অন্তরে যেন একটা সাড়া জাগিয়ে

তুলছিল। তার মনের গহনে একটা অস্পষ্ট সম্ভাবনা আকার পরিগ্রহ করবার দুর্দমনীয় বাসনায় যেন দুর্বার হয়ে উঠেছে। সেই যন্ত্রণা তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠছে। অথচ সে কি করবে তার কিছু ঠিক করতে পারছে না।

তার মনে হয়, অন্ধের মতো সে অন্বেষণ করছে পথ। জটিল ও দুর্গম অরণ্যে দিক ঠিক করতে পারছে না। শুধু প্রবেশ করছে গভীরতর অরণ্যে। যেখানে পথের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ে না।

কি করে পথ দেখতে পাবে এই তার প্রশ্ন। কে তাকে দেখিয়ে দেবে সেই পথ? এমন কে আছে যার কাছে সে উদ্ঘাটিত করবে অন্তরের রুদ্ধদ্বার? যেখানে সংঘাত চলছে জটিল প্রশ্নের, যা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে প্রতিনিয়ত।

প্রত্যহের দিনযাপন বৈচিত্রহীন হয়ে উঠছে। মনের আকাশে কালো মেঘ ঘনায়মান। সেখানে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিকাশ হচ্ছে। একটা আসন্ন ঘনঘটার সম্ভাবনায় সে হয়ে পড়ছে মুহ্যমান।

দুর্নিরীক্ষ ভবিষ্যতের দিকে সে চেয়ে দেখতে চেষ্টা করে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেখানে দৃষ্টি চলে না। উদাস ও ব্যথাতুর দৃষ্টি তখন সে ফিরিয়ে নেয় বর্তমানের দিকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে করে তোলে কাতর।

কিন্তু আর কোন দিকে সে চাইবে? অতীত জীবনের দিকে চেয়ে দেখবার প্রবৃত্তিও তার নেই। সেই কথা মনে হলেও তার সমগ্র অন্তর বিষিয়ে ওঠে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কিছুই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না। যত তার অশান্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে ততই তার চিন্তাধারা স্রোতবেগে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে এক বিরাট বিশৃঙ্খলার দিকে। উদাস ও বিষণ্ণ চিত্তে দিনের পর দিন তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে

হচ্ছে, দুর্বহ একটা বোঝা। অপরিসীম ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার মন।

তার একমাত্র ভরসা বিকাশ। তার দিকে উন্মুখ আগ্রহে তাকিয়ে সে প্রতীক্ষা করছে। ধৈর্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে মৃত্যু অথবা জীবন এই দুই-এর একটাকে বেছে নেওয়ার জন্য চলছে তার প্রাণান্তকর প্রয়াস। একদিক দিয়ে কঠিন ও শীতল পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে মৃত্যু অভ্যাসমলিন, ক্লান্তিকর ও মন্থর গতিতে আর একদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠছে এক অভিনব সুর মহারুদ্রের প্রলয়ঙ্কর নৃত্য ছন্দে। সেই সুর ভয়াল কিন্তু সুন্দর। সুন্দর ও ভয়ঙ্করের একত্র সমাবেশে যে বিচিত্র রাগিণী ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে, তার চিত্তের সবগুলি তারে মুখরিত হচ্ছে তার অণুরণণ।

সেই সুরের মূর্ছনা কৃষ্ণাকে অণুপ্রাণিত করে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে কান পেতে শোনে সেই সুর, যা তার কাছে দুর্বোধ্য হলেও তার অন্তরে সৃষ্টি করে এক অবর্ণনীয় অনুভূতির। আশঙ্কা ও মাধুর্য তাকে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত করে তোলে। অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা হয়ে ওঠে উদগ্র।

তার জীবনে আবির্ভূত হল বিকাশ এই সুর নিয়ে। অন্ধকার ভেদ করে জ্যোতির উদয়ের মতো একি অমৃত সে হাতে করে আনলে, যা আগুনের মতো উত্তপ্ত? মুহূর্তের মধ্যে লাঞ্ছিতা ও নিপীড়িতা কৃষ্ণা যার স্পর্শে উঠলো পরিপূর্ণ হয়ে। নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেল তার মনের গ্লানি। নিমেষের মধ্যে সে নিজেকে ফিরে পেলে, ফিরে পেলে তার অনাহত আত্মার শুচিতা।

সেই অনাহত আত্মা আকুল হয়ে উঠেছে অসঙ্কোচ প্রকাশের পিপাসায়। কৃষ্ণার যন্ত্রণা উঠছে অসহ্য হয়ে।

কালাচাঁদ ক্রুদ্ধ হলেন। গোবর্ধন স্পষ্ট করেই তাঁকে জানিয়ে দিয়ে

গেছে যে তাঁর কথামত কাজ সে করতে পারবে না। এর জন্য তার যা হয় হবে। সেজন্য সে দুঃখও করবে না। অবশ্য একথাও সে বলেছে যে, গোপনে সংবাদ নিয়ে জানাবার মতো কোন কাজ বিকাশ তার বাড়ীতে বসে করে না।

ক্রোধ-গম্ভীর কণ্ঠে কালাচাঁদ বলেছিলেন, সে কি কাজ করে আর না করে সেকথা তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়নি। যে কাজই সে করুক তার সমস্ত সংবাদ তোমায় দিতে বলা হয়েছিল। তা যখন পারবে না তখন আর কথার দরকার নেই।

কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বললেন, কিন্তু গোবর্ধন, কাজটা তুমি ভাল করলে না। এর ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।

তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে গোবর্ধনও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। তবু যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করে সে বলেছিল, দেখুন, বিকাশ শুধু আমার বাড়ীতেই আসে না। গোপালনগরের জোয়ান ছেলেরা তার নাম করতে পাগল। আপনার ছেলের সঙ্গেও তার ভাব কম নয়। তার খুঁটিনাটি খবর যদি আপনি জানতে চান সে তো আপনার ঘর থেকেই ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। এই গরীবকে ধরে টানাটানি করছেন কেন?

কথাগুলো শুনে কালাচাঁদ চমকে উঠেছেন। গোবর্ধনের কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল সেই ইঙ্গিত যথাস্থানেই আঘাত করেছে। গৌরীকান্তের সঙ্গে বিকাশের খুব ভাব এই কথাটা প্রকারান্তরে জানিয়ে সে যেন তাঁকে একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে গেল। তখনকার মতো তাকে কিছু বলতে না পারলেও তার কথা পরিপাক করতেও তিনি পারছেন না।

গৌরীকান্তের সঙ্গে বিকাশের অন্তরঙ্গতা বেশী সে কথা তো তিনি নিজেই জানতেন কিন্তু গোবর্ধনের মুখ থেকে কথাটা শোনবার পর ওই চিন্তাটাও যেন তাঁর কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। তিনি মর্মে মর্মে

অনুভব করছেন গৌরীকান্ত ক্রমেই তাঁকে এমন এক স্থানে ঠেলে নিয়ে চলেছে যেখানে তিনি অসহায়। এই সহায়হীনতাকে উপলব্ধি করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মর্মপীড়াও হয়ে উঠছে অসহ্য।

তাঁর মনের মধ্যে বিস্তারলাভ করছে একটা প্রতিশোধাত্মক মনোভাব। বিকাশ যেন তাঁর কাছ থেকে এক অমূল্য সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে যা তাঁকে ফিরে পেতেই হবে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দস্যুকে এমন শাস্তি দিতে হবে যার যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চীৎকার করেও সে নিস্তার পাবে না। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উজাড় করে সেখানে যত কিছু শয়তানী মতলব সঞ্চিত হয়ে আছে তার প্রত্যেকটি তিনি পরীক্ষা করে দেখছেন সন্তর্পণে।

ছোটলোকদের স্পর্ধা ক্রমেই বাড়ছে। নচেৎ গোবর্ধন তাঁর সঙ্গে এইভাবে কথা কইতে সাহস পায় কোথা থেকে? গোপালনগরে এই ধরণের ঘটনা আর কখনো ঘটেছে বলে তাঁর স্মরণ হয় না।

এখানকার মাহিষ্যদের ব্রাহ্মণ-ভক্তি অসীম। ব্রাহ্মণেরা তাদের কোন আদেশ করলে তারা কৃতার্থ হয়ে যায়। সেই মাহিষ্যদের আজ একি পরিবর্তন? যারা ব্রাহ্মণের দাস বলে পরিচয় দিত তারা কোন সাহসে তাঁদের প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করে?

এও সেই বিকাশের শিক্ষা! মনে মনে তিনি গর্জন করে উঠলেন। সে ছোটলোকদের উস্কে দিচ্ছে যাতে তারা বর্ণশ্রেষ্ঠদের অসম্মান করে। নিজের প্রভাব বাড়াবার জন্য সে ছোটলোকদের মাথায় তুলছে।

তিনি শঙ্কিত হলেন। সমাজনীতিকে যে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চায় সে যে কতবড় পাষণ্ড সেকথা তিনি ভেবে পেলেন না। জীবনে বহু বিরুদ্ধতার সম্মুখীন তিনি হয়েছেন, অনেক দুর্দান্ত শত্রু তাঁর কাছে বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে কিন্তু এই ধরণের শত্রুর সামনাসামনি তিনি আর কখনো পড়েননি। তাঁর অপকৌশলকে গ্রাহ্য করে না, দৃঢ়মূল সংস্কার অবধি বিপর্যস্ত করে দিতে চায় সে এমনি ভয়ানক।

আর একদিক থেকেও তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। দাস্থ মুখুয্যের সঙ্গে তাঁর যে মোকদ্দমা চলছে গোবর্ধনই তার প্রধান সাক্ষী। এর পরে সে যে আর সাক্ষী দেবে না বা দিলেও তাঁর বিরুদ্ধে বলবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। অথচ এখন মামলা তুলে নিলে যে সত্তর বিঘা ধানজমি আত্মসাৎ করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিলো এবং যে অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে তিনি কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন তার আশা সমুলে নষ্ট তো হয়ই উপরন্তু জ্ঞাতিশত্রুর কাছে তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হয়। আর শুধু জ্ঞাতিশত্রুই বা কেন? গোবর্ধনও কি হাসবে না?

এই জমির ওপর তাঁর বহুদিনের লোভ। গোপালনগরে এমন জমি আর নেই। সত্যসত্যই সোনা ফলে। বহুদিন থেকে জমিটা বিনামূল্যে লাভ করবার সুযোগের অনুসন্ধান করছেন তিনি। সুযোগ পেয়েওছিলেন কিন্তু শেষরক্ষা হবে কি করে?

গোবর্ধন প্রধান সাক্ষী। তার মুখের একটি কথায় মামলা ঘুরে যাবে।

তাঁর যতখানি রূঢ় হওয়া উচিত ছিলো তার ওপর, ততখানি রূঢ় তিনি হতে পারেননি। তিনি তাকে চোখ রাঙিয়েছেন সেকথা সত্য কিন্তু সেই রাঙা চোখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়েছিল আশঙ্কা। সেই আশঙ্কার ছায়া সে দেখতে পেয়েছে কিনা কে জানে?

অকস্মাৎ কালাচাঁদ অনুভব করলেন যে তাঁর প্রভাব, প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রম বিপন্ন হয়ে উঠছে। তাঁর ললাট চিন্তাকুটিল হয়ে উঠলো।

তাঁর জীবনে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।

দাওয়ার একদিকে বসেছিল গৌরীকান্ত আর একদিকে কৃষ্ণা।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। পাণ্ডুর চাঁদ। হিম আর কুয়াশার অন্তরালে ম্লানজ্যোতি চাঁদ যেন বিষণ্ণ! একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দাওয়ার

ওপরে। রুগ্ন শিশুর করুণ হাসির মতো। সামনের ঘনপল্লবিত নিমগাছটার শাখাপ্রশাখায় সেই ফিকে জ্যোৎস্নার লুকোচুরি সৃষ্টি করছে রহস্যের।

গৌরীকান্ত বলছিল. সমস্ত সংবাদই আমি বিকাশদাকে দিয়েছি। সে শীগগির আসবে।

—আসবে ?—কৃষ্ণা বললে, তাকে নিয়ে যদি পুলিশে টানাটানি করে ?

গৌরীকান্ত মৃদু হাসলে। বললে, বিকাশদা পুলিশকে ভয় করে না কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো গৌরীকান্তের দিকে। বিকাশ পুলিসকে ভয় করে না সেকথা তো তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন তার মুখ দিয়ে বেরোল তারও কোন অর্থ তার বোধগম্য হল না। তার দৃষ্টির মধ্যে কি ভাব প্রচ্ছন্ন ছিলো অন্ধকারে গৌরীকান্তের কাছে তা অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণা বললে, বিকাশদা আর কি বললে ?

—বললে........গৌরীকান্ত থেমে গিয়ে চতুর্দিকে একবার চেয়ে নিলে। তারপর বলতে লাগলো কণ্ঠস্বর নামিয়ে, কৃষ্ণাকে জানিয়ে দিও আমরা সকলেই চলেছি এক গুরুতর সঙ্কটের ভিতর দিয়ে। ভবিষ্যত আরো সঙ্কটময়। অন্ধকার ছাড়া কোনদিকেই আলোর রেখা চোখে পড়ে না। কিন্তু এর ভিতর দিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

—তারপর ? —কৃষ্ণার ব্যগ্র কণ্ঠ গৌরীকান্তের একাগ্রতা ভঙ্গ করলে। কথাগুলো বলে মনে মনে সে কি ভাবছিল।

—তোমাকে কাজে নামতে বলেছে। চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, তারা কি অবস্থার মধ্যে আছে সেকথা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া আর প্রয়োজন হলে তোমার নির্দেশ যাতে তারা পালন করে এমনভাবে তাদের সংগঠিত করে তোলা, এই হবে তোমার কাজ।—চিন্তামগ্ন গৌরীকান্ত আপনমনেই কথাগুলো বললে।

কৃষ্ণা স্তব্ধ হয়ে রইলো পাণ্ডুর চাঁদের দিকে চেয়ে। দূর থেকে মুক্ত বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ভেসে আসছিল। নিমগাছের আন্দোলিত শাখা-প্রশাখায় কেঁপে উঠছিলো ফিকে জ্যোৎস্না। দূরের সোঁ সোঁ শব্দ আর নিমগাছের আন্দোলনের মধ্যে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা নিয়ে কৃষ্ণা রইলো বসে।

গৌরীকান্ত বললে, বিকাশদা বলে দিয়েছে এবার এসে সে তোমার এখানে উঠবে না। তার জন্য তুমি যেন দুঃখ করো না। তোমাকে বা গোবর্ধনকে পুলিশ অযথা হয়রাণ করবে সে তার অভিপ্রেত নয়। তোমাদের অসুবিধা ঘটাতে সে চায় না।

—অসুবিধা?—কৃষ্ণা বললে।

—অসুবিধা বইকি। তোমরা অনর্থক হয়রাণ হলে তাতে আমাদেরও ক্ষতি হবে।

কৃষ্ণা মৃদু হাসলে। বললে, আমাকে হয়রাণ হতে হবে কেন? পুলিশ লোক চেনে। যারা কাজের লোক তাদের পিছনেই তারা ঘুরে বেড়ায়।

—তুমি কি কাজের নও?—গৌরীকান্ত বললে।

—না।—কৃষ্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—তুমি নিজেকে চেন না। তোমার ওপরে যে বিকাশদা'র কতখানি আশা!

কৃষ্ণা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলো। সহজ আর স্বচ্ছন্দ হাসি। অস্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর থেকে সে যেন এবার নিঃসঙ্কোচ হয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে।

—হেসো না।—গৌরীকান্ত বললে, আমার কথা তুমি উড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু বিকাশদা'কে অবহেলা করতে পারো না। সে লোক চেনে না, এতবড় মিথ্যা তুমি কিছুতেই বলতে পারবে না।

—আমি তো সে কথা বলিনি?—কৃষ্ণা বললে, বিকাশদা'র ওপর

আমার শ্রদ্ধা কারো চাইতে কম নয়। তা বলে সে যদি একটা যা-তা কথা বলে তো সেই কথাকেই সত্যি বলে স্বীকার করে নিতে হবে?

গৌরীকান্ত কি বলতে গেল প্রতিবাদ করার ভঙ্গীতে কৃষ্ণা তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, শোন আমি যা বলি। তোমার কথা এখন থাক। তুমি তাকে বলে দিও যে সে গোপালনগরে আসবে অথচ আমার এখানে এসে উঠবে না, সে হতেই পারে না। রাত একটা নেই, দুটো নেই, সে আসবে। তাকে রেঁধে ভাত দেবে কে? আমার বাড়ীতে না এলে তাকে গোপালনগরে আসতে হবে না!—তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো অভিমান।

—তুমি বুঝছ না কৃষ্ণা।—গৌরীকান্ত বললে, বিকাশদা না ভেবে কোন কাজ করে না।

—আমি কোন কথা শুনব না। গোপালনগরে এলে তাকে এখানে আসতে হবে। নাহলে আমি মাথা খুড়ে মরব।—কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর শোনালো আর্তনাদের মতো।

গৌরীকান্ত সবিস্ময়ে কৃষ্ণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

কৃষ্ণা আবার বললে, আমাকে পুলিশে ধরবে এই তো কথা? ধরুক, আমি তাতে ভয় পাইনে।

—কিন্তু শুধু শুধু তাদের সন্দেহভাজন হয়ে লাভ কি?

কৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলে না। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, তোমাকে যা বললুম বিকাশদা'কে তুমি সেই কথাই বোলো। অতশত তর্ক আমি করতে পারি না। গোপালনগরে এসে সে আমার বাড়াতে উঠবে না, সেকথা আমি ভাবতেও পারি না।

—একে পাগলামো ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।—গৌরীকান্ত বললে।

—বেশ, তাই বোলো।—কৃষ্ণা ম্লান হাসলে।

চিন্তার জাল বুনছে গৌরীকান্ত। তার হাতে অনেক কাজ। কিন্তু কোন কাজ এগোচ্ছে না। অনেক কিছু করবার রয়েছে। তার গতি যেন অকস্মাৎ হয়ে উঠেছে ধীর ও মন্থর। চেষ্টা করেও সে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে পারছে না। এদিকে অন্য অসুবিধাও রয়েছে যথেষ্ট। তার বাবা ক্রমাগত তাকে বাধা দিচ্ছেন প্রত্যেক কাজে। নানাভাবে তিনি চেষ্টা করছেন তাকে তাঁর মতানুবর্তী করতে। এই নিয়ে ছোটখাটো কলহও হচ্ছে। একটা অস্বাচ্ছন্দকর আবহাওয়া তার চিত্তের প্রফুল্লতা নষ্ট করে দিচ্ছে।

সম্প্রতি গোবর্ধনকে নিয়ে যে ঘটনার উদ্ভব হয়েছে সেই নিয়ে সে হয়েছে জটিলতার সম্মুখীন।

থানার বড়বাবু আর তার বাবা গোবর্ধনকে ভয় দেখিয়ে দলে টানবার চেষ্টা করছেন। গোবর্ধন কিন্তু কিছুতেই তাঁদের হাতের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হতে রাজী নয়। কৃষ্ণাও তাকে সেই পরামর্শ দিয়েছে। কৃষ্ণার পরামর্শে তারও রয়েছে সমর্থন।

তার বাবাকে সমর্থন করবার কথা সে চিন্তা করতেও পারে না। বাড়ীর আবহাওয়া তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

বাড়ী ছেড়ে তার চলে যেতে ইচ্ছা হয়।

যে আকর্ষণ মানুষকে সংসারে বেঁধে রাখে সে আকর্ষণ তার নেই। স্নেহের সম্পর্ক, যা তার কাছে ছিলো অতুলনীয় সম্পদ, সেই সম্পদ সে হারিয়েছে তার মা'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। বর্তমানে সে নিঃস্ব। একটা অবর্ণনীয় শূন্যতা নিঃশব্দ হাহাস্বনে তাকে অনুক্ষণ বেদনাবিধুর করে রাখে। তার বাবা তাকে স্নেহ করেন সেকথা সে জানে। কিন্তু এই স্নেহকে কিছুতেই সে সহ্য করতে পারে না। এর চেয়ে তিনি যদি তার ওপর বিদ্বেষ পোষণ করতেন তাহলে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত।

তবু সে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারছে না। গোপালনগরের জনসাধারণকে সে ভালবাসে। তা ছাড়া কৃষ্ণা কাজ করবার উপযুক্ত না হয়ে ওঠা অবধি তাকেই এদের মধ্যে কাজ করতে হবে।

সে যেন হাঁপিয়ে উঠছে।

গোপালনগরের মধ্যে একমাত্র এই বাড়ীটিই তার ভাল লাগে। যখন তখন সে এখানে ছুটে আসে অশান্ত চিত্তে। শান্ত সমুদ্রের মতো সুন্দর আর অরণ্যের মতো গম্ভীর কৃষ্ণার কাছে বসে সে শান্তি পায়। তার বিস্ফারিত চোখের কালো তারার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে সে জীবনের বহু প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে। ভবিষ্যতের মতো দুজ্ঞেয় সেই বিশাল চোখের দৃষ্টি। চেয়ে থাকতে থাকতে তার মন হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ।

কৃষ্ণাব কাছে সে খোঁজে সান্ত্বনা।

কৃষ্ণারও গৌরীকান্তকে ভাল লাগে।

এই একটিমাত্র তরুণকেই সে দেখেছে যে সাধারণ হলেও সুন্দর। তার মধ্যে বিকাশের পর্বত-সদৃশ দৃঢ়তা নেই, নেই প্রখর ব্যক্তিত্ব কিন্তু সারল্যের আবরণে যে বলিষ্ঠ মন বিপুল কর্মপ্রেরণায় চঞ্চল হয়ে রয়েছে. সেই মন তাকে আকর্ষণ করে।

তার নিজের হাতে নিকিয়ে নেওযা দাওয়াটির মতো পরিচ্ছন্ন গৌরীকান্তের মন। একাগ্র ও তন্ময় হয়ে সে কাজ করে। এমন অসাধারণ কর্মনিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। তার সারল্য আর স্পষ্টবাদিতা অনেকের কাছে তাকে অপ্রিয় করে তুললেও যে তার মনের পরিচয় পেয়েছে সে তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারবে না।

কৃষ্ণার মনে হয় জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই গৌরীকান্ত জাতীয় লোকদের বিশ্বাস করতে পারা যায। সে সেই দলের, যারা জীবনের মূল্যেও বিশ্বাসের ঋণ পরিশোধ করতে পশ্চাৎপদ হয় না।

চাঁদ অনেকখানি উঠে এসেছে। খণ্ড খণ্ড মেঘের আড়ালে তার

ম্লানায়মান জ্যোতি নিষ্প্রভ। জ্যোৎস্নাও যেন বিবর্ণ। নিমগাছের ঘনপল্লবিত শাখা-প্রশাখায় অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে।

বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ আগেকার চেয়ে আরো প্রবল হয়ে উঠলো। নিমের শাখার আন্দোলন হয়ে উঠলো দ্রুত। তার সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো গাছের ছায়া। সেই ছায়ার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কৃষ্ণা। সে যেন গভীর ভাবে কি ভাবছে। জীবনে অপ্রত্যাশিতকে লাভ করার জন্য অকস্মাৎ সে যেন উঠেছে উদ্বেল হয়ে।

হঠাৎ একসময় সে প্রশ্ন করলে, আমি কি কাজ করতে পারব?

অন্যমনস্ক গৌরীকান্ত সচকিত হয়ে উঠলো। বললে, পারবে বই কি?

—তুমি আমায় সাহায্য করবে?—কৃষ্ণার কণ্ঠ গম্ভীর।

—আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।—দৃঢ়তার সঙ্গে গৌরীকান্ত বললে।

—আমার জীবনে এ এক পরম লাভ। —মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণা বললে।

গৌরীকান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে চাইলে।

একবার তার ইচ্ছা হল যে তাকে জিজ্ঞাসা করে, কোনটা তার পরম লাভ? বিকাশের দেওয়া কাজের দায়িত্ব, না তার দেওয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি? কিন্তু সেকথা জিজ্ঞাসা করা তার হল না।

কৃষ্ণা ততক্ষণে ফিরে তাকিয়েছে নিমগাছের সেই অন্ধকার ছায়ার দিকে। তেমনি নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে।

পাঁচ

বসন্ত এল।

গোপালনগরের রুক্ষ ও কনকনে বাতাসে জেগে উঠলো মদির আবেশ। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে নবজীবনের স্পন্দন যেন আকার পরিগ্রহ করলে। শীতার্ত ও শীর্ণা প্রকৃতি হয়ে উঠলো সতেজ ও শ্রীময়ী।

আকাশ পাখীর গানে হল মুখর। নানা রঙের ফুলে বিচিত্রিতা প্রকৃতি মানুষের মনেও রঙ ধরিয়ে দিলে। অশোক, কিংশুক আর পলাশ গাছের পুষ্পিত শাখাগুলি পৃথিবীকে করে তুললে কুসুমাস্তীর্ণ। রসাল-মঞ্জরী বিকীর্ণ করতে লাগলো গন্ধ। গম্ভীর ও ধীর বট ও অশ্বত্থ বিপুল শাখা প্রশাখা বিস্তার করে অতীতকালের সাক্ষ্য আর ভবিষ্যত ইতিহাসের ইঙ্গিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ধ্যানমগ্ন ও সমাহিতচিত্তে।

মানুষ চললো অগ্রসর হয়ে তাদের মনের অন্ধকার আর চোখের আলোকোজ্জল দৃষ্টি নিয়ে অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের আহ্বানে।

প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোপালনগরের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। ষ্টেশনের দিক থেকে আসবার পথে গ্রামে ঢুকতে যতগুলি মাঠ পড়ে তার সবগুলি ভরে উঠেছে ছোট ও বড় অজস্র তাঁবুতে। সব মাঠ-গুলো তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। গোপালনগর থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত দীর্ঘ আড়াই ক্রোশ পথ সারি সারি অয়ারলেস পোষ্ট। পোষ্টের মাথা দিয়ে বরাবর তার চলে গেছে। এক জায়গায় একটি বিমান অবতরণ ক্ষেত্র। তার কিছুদূরে দুদিকে দুটি বিমানবিধ্বংসী কামান বসানো।

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কাঁচা রাস্তার ওপর পাথরকুচি ফেলে পিচ ঢালা

হচ্ছে। কলকাতা থেকে সাপ্লাই নিয়ে মিলিটারী ভ্যান আসছে ঘন ঘন। গোপালনগরের পথেঘাটে বিচরণ করছে শ্বেতাঙ্গ সৈনিক।

তাদের চোখে সীমাহীন কৌতূহল। ভারতবর্ষে আর কখনো তারা আসেনি। এখানকার লোকগুলির দারিদ্র আর সহিষ্ণুতা তারা নিরীক্ষণ করছে অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে। গ্রামবাসীদের আচার ব্যবহার তাদের যত না বিস্মিত করছে দুঃখ ও দুর্দশা তাদের কৌতূহলী করে তুলেছে তার চেয়ে ঢের বেশী করে।

ভারতবাসী মানুষ নামের যোগ্য নয় সেকথা তারা তাদের দেশে শুনেছে বহুবার। সেই কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা এখন তারা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করে। যে অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে এখানকার লোক জীবনধারণ করে মানুষ কখনো সেই অবস্থা ও ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। সে সম্বন্ধে তাদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

কৃপা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তারা চেয়ে চেযে দেখে লোকগুলির দিকে। শ্রেষ্ঠত্ববোধের দম্ভে তাদের লাল মুখ আরো লাল হয়ে ওঠে। ভারী মিলিটারী বুটের শব্দে পথ মুখরিত করে তারা এদের পাশ দিয়ে চলে বুক ফুলিয়ে জীবন্ত মানুষের পথচলার নির্ভুল পদ্ধতিতে। পদক্ষেপণে যাদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না তারা সঙ্কুচিত হয়ে একধারে সবে গিযে চেয়ে থাকে সেই উদ্ধত গতিভঙ্গীর দিকে।

তাদের কারো সঙ্গে মেশবা প্রযোজন হয় না। নিজেদের প্রয়োজন মতো সব কিছু তারা পায় হেড-কোয়ার্টার থেকে। যদিও তারা যুদ্ধ করতে এসেছে সমুদ্রের পরপার থেকে, তবু তারা যাতে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে তাদের দেশের কর্তৃপক্ষের কোন ত্রুটি হয়নি। বই আর প্রসাধন দ্রব্য থেকে সুরু করে জীবনধারণের যাবতীয় উপকরণের প্রচুর সরবরাহ আসছে। তারা জীবনকে উপভোগ করছে পরিপূর্ণভাবে এই যুদ্ধের আবহাওয়াতেও। সুদূর পল্লীগ্রামে একটা নাচঘর পর্যন্ত তারা

তৈরী করেছে। জীবনের স্বচ্ছন্দতা যাতে না ক্ষুণ্ণ হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার জন্য তাদের চেষ্টার অবধি নেই।

মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকবার তীব্র অহঙ্কার নিয়ে তারা এখানে-সেখানে বিচরণ করে আর মাঝে মাঝে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে সেই মানুষগুলির দিকে যারা আজো কোনরকমে বেঁচে আছে। দুঃখে ক্ষোভে ও হতাশায়, অত্যাচারে অবিচারে ও উৎপীড়নে যারা হযে উঠেছে নিস্তেজ ও প্রাণহীন। যাদের মধ্যে জীবনের স্পন্দন ক্ষীণ হয়ে আসতে আসতে একেবারে থেমে যাওয়ার চরম মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। মরা নদীর বিস্তীর্ণ চড়ায় স্রোতস্বিনীর করুণ ইতিহাসের প্রতি মৃত্যুর শানিত বিদ্রূপ যেখানে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অকূল সমুদ্রে জাহাজডুবির পরে নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় আরোহীরা জীবনরক্ষার চিন্তায় যেমন উন্মাদ হয়ে ওঠে তেমনি ধরণের চিন্তায় এই মানুষগুলি হয়ে উঠেছে বোধ-শক্তিহীন। সেই উন্মত্ত আবেগ বাইরে থেকে বিদেশীদের চোখে পড়ে না। অসহায়ের আর্ত কাকুতিকে তারা মুমূর্ষুর মৃত্যু-যন্ত্রণা বলে মনে করে। ভাবে, এই অবজ্ঞাত মানুষগুলোর বেঁচে থাকবার কোন অধিকারই নেই। দেশে থাকতে বহুবার তাদের শোনানো হয়েছিল যে মানুষ বলে পরিচিত হওয়ার যোগ্যতা এদের নেই। সেকথা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভিতর দিয়ে তাদের বিশ্বাসে পরিণত হয়।

তারা এই লোকগুলিকে ঘৃণা করে। এরা তাদের দিকে চেয়ে থাকে শঙ্কা ও সম্ভ্রমমিশ্রিত দৃষ্টিতে। দুই দলের মাঝখানে, উপর আর নীচের বিরাট ব্যবধান। এক শ্রেণীর বঞ্চিত আর অভিশপ্ত আত্মা অন্য শ্রেণীর বাঞ্ছিত স্বর্গরাজ্যের দ্বারে ভিখারীর মতো হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

নিজেদের আনন্দে যারা নিজেরা পরিপূর্ণ, দৈন্যের স্পর্শ যারা সহ্য করতে পারে না, গ্লানির কথা চিন্তা করতেও ভয় পায়, একদিকে প্রাচুর্য আর একদিকে অভাব এই অসামঞ্জস্য তাদেরও বিচলিত করে কিন্তু সেই

চাঞ্চল্যকে জোর করে তারা বিযুক্ত হয়। যাদের দিকে তাকাবে সহানুভূতি ও সমবেদনা নিয়ে, তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে আনন্দ পায়।

সেইজন্যই জীবনের স্রোত একদিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কূলে কূলে ভরে ওঠে নদী। বিপরীত দিকে মরা নদীর শীর্ণ ও ক্ষীণ জলধারা। পঙ্কিল আর কদর্য জলে জেগে ওঠে বুদ্বুদ।

এই দুই অসম জীবনধারা গোপালনগরে জাগিয়ে তুললে আলোড়ন।

উন্মুক্ত প্রান্তর তাঁবুতে ভরে গেল। শীতে যে মাঠ থেকে ধান কাটা হয়েছিল, বসন্তে সেই মাঠে আর স্থান রইলো না। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। চাষ করবার জায়গা নেই।

গোপালনগরের সকলেই উঠলো উদ্বিগ্ন হয়ে।

বিপদ মাহিষ্যদের বেশী। ব্রাহ্মণদের জমি তারা ভাগে চাষ করে। তাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই নিজের জমি আছে। চাষ না হওয়ার অর্থ কি সে কথা ভেবে তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণরাও অসুবিধায় পড়লো। তাদের মধ্যে কালাচাঁদের জমিই বেশী। বারোখানা লাঙলের চাষ তাঁর। প্রতিবছরে মাঠের ফসল যা ঘরে ওঠে তার থেকে তাঁর মোটা আয় হয়। এই আয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁর জ্ঞাতিরাও চিন্তা করতে লাগলো। তবু তাদের এইটুকু সান্ত্বনা রইলো যে মাঠে চাষ না হলেও তাদের উপোষ দিতে হবে না।

কিন্তু মাহিষ্যেরা শুনতে পেলে নির্মম মৃত্যুর রূঢ় পদক্ষেপ। অনশনের রুক্ষ ও বীভৎস মূর্তি কল্পনা করে আতঙ্কে তারা উঠলো শিউরে।

যুদ্ধের চরম সঙ্কট তখন ঘনিয়ে উঠছে। সুদূর প্রাচ্য থেকে ব্রিটিশ সেনাদল পশ্চাদপসরণরত। জার্মাণীর দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীর পদভরে রুশিয়া টলমল করছে। চতুর জাপানী এক আঘাতে ইংরেজ ও আমেরিকার প্রাচ্যের সাম্রাজ্য নিয়েছে কেড়ে। একটির পর একটি দেশ হারাতে

হারাতে ইংরেজ ভারতবর্ষে তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করছে।

ভারতবর্ষে জাপানী আক্রমণ আসন্ন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হচ্ছে অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে ধীর ও মন্থর গতিতে। একদিকে ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালানো হচ্ছে অন্যদিকে ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে ছেঁকে তুলে বাছা বাছা কর্মীদের পাঠানো হচ্ছে কারাগারে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরেও বিপন্ন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ এড়াবার জন্য কংগ্রেস উপস্থিত করেছে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দাবী।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে চলে গেছেন।

চরমপন্থীরা সংগ্রামের জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। বহু তিক্ত ও বিরক্তিকর স্মৃতি তাদের মনের আকাশে পক্ষবিস্তার করছে কুটীল মেঘের মতো। দেশে সৃষ্টি হয়েছে এক নৈরাশ্যকর মনোভাবের। সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে সেই মনোভাব অধিকতর অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

দমননীতির ষ্টীমরোলার চলছে পূর্ণবেগে।

নতুন নতুন অর্ডিন্যান্স জারী হচ্ছে। সেই সব অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে জীবনধারণ করাও তার প্রভাবের মধ্যে পড়ে। অস্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন বহু অতিরিক্ত আদালতের সৃষ্টি হয়েছে জনগণকে নির্যাতিত করবার জন্য।

ভারতবর্ষের টুঁটি টিপে ধরে তার বুক থেকে বিপ্লবের বহ্নিশিখার শেষ স্ফুলিঙ্গটিকে অবধি নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সারা দেশকে আতঙ্কগ্রস্ত করে দেশবাসীকে হতাশ আর নির্জীব করে তোলবার প্রয়াস পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

কালো মেঘে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের আকাশ আসন্ন প্রলয় সম্ভাবনায় হয়ে উঠেছে ভয়াল।

দাসু মুখুয্যের ছেলে বঙ্কিম বর্মা থেকে ফিরে এল রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে। যে করে সে দেশে ফিরেছে সে রকম করে কেউ নাকি ফেরে না। ফিরতে গিয়ে তার চোখের সামনে কত লোক পথে লুটিয়ে পড়েছে আর ওঠেনি। কত সংসার ভেসে গেছে। কত ধনী পরিণত হয়েছে ভিক্ষুকে। কত মানুষ হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন।

যুদ্ধের অভিশাপ এমনি ভয়ানক। তার কাছে কারো মার্জনা নেই।

বঙ্কিমের কাছে কিন্তু সেই অভিশাপ আশীর্বাদে রূপান্তরিত হয়েছে। বহুকাল আগে সে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। গোপালনগরের ব্রাহ্মণদের মধ্যে তাদের অবস্থাই ছিলো সব চেয়ে অস্বচ্ছল। অর্থাভাবে বঙ্কিমের লেখাপড়াও বেশীদুর এগোয়নি। অভাবের স্পর্শ শৈশব থেকেই তার মনকে করেছিল প্রভাবিত। রুক্ষ ও কুটীল দারিদ্র কৈশোর থেকেই তাকে করে তুলেছিল অর্থলোলুপ। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো যে সে ধনী হবে।

যৌবনে কাকেও কিছু না বলে বাড়ী ছেড়ে সে চলে যায়। কিছুদিন কোলকাতায় এদিকে-ওদিকে ঘুরে ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি দেয় বর্মায়। সেখানে সে একটা চাকরীও যোগাড় করেছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। বুদ্ধিকৌশলে ছোটখাটো মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট যোগাড করে সে কিছু সঞ্চয় করে নিলে।

যোগাড়ে ছেলে বঙ্কিম। ছোটাছুটি করতে পারে। সন্ধান-সুলুকও জানে। সুতরাং তার উন্নতির পথ বাধামুক্ত। বাধ্য হয়ে বর্মা ছেড়ে চলে আসবার পরেও সে চুপ করে বসে রইলো না। গোপালনগরের মিলিটারী ক্যাম্পের যাবতীয় ফার্ণিচার সরবরাহ করবার অর্ডার সে যোগাড় করলে। অপরের ক্ষুব্ধদৃষ্টির সামনে দিয়ে সে হাস্যোজ্জল মুখে আনাগোনা করতে লাগলো এখানে-ওখানে। আমকাঠের আলমারী আর শিমুলকাঠের টেবিল চেয়ার পালিশের জলুষে ঝকঝকে হয়ে চালান

যেতে লাগলো। দূরে দূরে আরো যে সব ক্যাম্প হয়েছিল সেই সব জায়গা থেকেও সে অর্ডার যোগাড় করতে লাগলো।

গোপালনগরে সে একটা কাঠের গোলাও করলে।

বামুনপাড়ায় শোনা গেল অস্ফুট একটা গুঞ্জন। চাপা ঈর্ষায় সকলের মুখ উঠলো কালো হয়ে। বিদ্বেষে হাওয়া হয়ে উঠলো ভারী।

দামী সিগারেটে টান দিতে দিতে হাস্যকুঞ্চিত মুখে বঙ্কিম উপভোগ করতে লাগলো এই আবহাওয়া। বেছে বেছে ব্যক্তিবিশেষকে ডেকে সে খাওয়াত চা আর সিগারেট। বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে ভোজ দিতেও আরম্ভ করলে।

তার সম্বন্ধে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো নানা গুজব।

গোলার অফিস ঘরে বসে মৃদুহাস্যের সঙ্গে সে সেই মুখরোচক গুজব পরিপাক করতে লাগলো আর তার ছোট ছোট চোখ দুটি লোভে ও ক্রূরতায় হয়ে উঠলো উজ্জ্বল। সেই সব গুজব তাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সে কথা ভাবতেও সে গর্ববোধ করতে লাগলো। সেই গর্ব তার কল্পনায় ভবিষ্যতের বহু মনোহর ছবিকে চিত্রিত করে তুললে। সে আত্মহারা হয়ে উঠলো। ধাপে ধাপে ওপরে ওঠবার সর্বাঙ্গসুন্দর একটি পরিকল্পনা সে ইতিমধ্যেই রচনা করে ফেলেছে। মানসিক বিলাসের অসহ্য আনন্দে সে মগ্ন হয়ে গেল সেই পরিকল্পনা নিয়ে।

করাতের কর্কশ শব্দ শোনা যায়। হাতুড়ির ঠকাঠক চিন্তা জগতের সূত্রগুলিকে দেয় বিচ্ছিন্ন করে। অফিস ঘরের টেবিল চেয়ার, কাগজপত্র, বঙ্কিমের জামাকাপড় করাতগুঁড়োয় ভরে ওঠে। মাথার তৈলাক্ত চুলে জড়িয়ে যায় সেগুলো। অবহেলাভরে সে চেয়ে থাকে ঝকঝকে টেবিল চেয়ারের ওপর জমে ওঠা ধূলিকণার মতো সূক্ষ্ম একটা স্তরের দিকে।

সকলের সঙ্গেই তার সদ্ভাব। আলাপ জমাতে সে অদ্বিতীয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা নিয়ে আলোচনা করতে তার আপত্তি

আছে। গৌরীকান্তের সঙ্গে সে রাজনীতির সূক্ষ্ম তর্ক করে, কালাচাঁদকে বোঝায় যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা, ক্লাবে পাড়ার ছেলেদের নাটকের মহলা দেওয়ার সময় তার উৎসাহের সীমা থাকে না, আবার কৃত্তিবাস মোড়লের সঙ্গে সে চাষবাসের কথাও কয়। কৃত্তিবাসের বিধবা মেয়ে শশীতারার সঙ্গেও সে রসিকতা করে।

কিন্তু আলাপে আলোচনায় ও তর্কে, আচারে আচরণে ও আকাঙ্ক্ষায় একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার তার মুখের ভাঁজে ও রেখায় আকার পরিগ্রহ করে। সকলের চেয়ে সে বেশী জানে আর বেশী বোঝে এমনি একটা ভাব আত্মপ্রকাশ করে তার ভিতর থেকে। অহমিকা সে গোপন করতে পারে না।

সম্ভবত সেইজন্য অনেকে তার সঙ্গে মিশতে সঙ্কোচ বোধ করে। কথা কইতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। সেই সঙ্কোচ আর দ্বিধা তাকে করে তোলে পুলকিত। মানুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশতে পারার পক্ষে তার সব চেয়ে বড় বাধা নির্লজ্জ আত্মপ্রচার। সেকথা সে জানে না তা নয়। কিন্তু সেই আত্মপ্রচারের আনন্দ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখতে পারে না। তার ঔদ্ধত্যে আর অহমিকায়, চা আর সিগারেটের অকৃপণ বিতরণে, ভোজের উদার অথচ অভিসন্ধিমূলক আয়োজনে সেই উল্লাস ওঠে ফুটে।

এত অল্প দিনের মধ্যে বঙ্কিম যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে সেকথা কেই বা ভেবেছিল? সবার অলক্ষে সে যে কি করে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠলো সেকথা ভেবে সকলেই গেল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে।

বর্তমানে সে একজন সম্ভ্রান্ত লোক। সেজন্য তার বাবা দাসু মুখুয্যেও গণ্যমান্য হয়ে উঠেছে। কালাচাঁদের বিরোধিতায় দাসু সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল। ছেলের দৌলতে তার অপ্রত্যাশিত ভাগ্যোন্নতিতে সকলের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হল।

কালাচাঁদও ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারলেন না। তিনি থাকতে গোপালনগরে আর কেউ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে সে কি করে তিনি সহ্য করবেন ?

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। যে গোপালনগরে বামুনদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ, পরস্পর পরস্পরের ছায়া মাড়াতেও যেখানে সঙ্কোচ বোধ করে, সেখানে এমন ধরনের একটা আশ্চর্য কাণ্ড কি করে ঘটলো সেকথা ভাবতে গিয়ে কালাচাঁদ বিস্ময়ের সমুদ্রে দিক হারিয়ে ফেললেন।

প্রবাস থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই বঙ্কিম একদিন বিনা আহ্বানে তাঁর বাড়ীতে এসে দাঁড়ালো এবং তাঁর পদধূলি নিয়ে বললে, জ্যেঠামশাই, ধানজমিটা আপনিই নিন। আমরা আর মামলা চালাব না।

কালাচাঁদ জীবনে আর কখনো এতখানি বিস্মিত হননি।

মামলা নিয়ে তিনি তখন সঙ্কটে পড়েছেন। প্রধান সাক্ষী গোবর্ধনের ওপর ভরসা করে মামলা চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক হয়ে পড়েছে, আবার মামলা তুলে নিতেও আত্মসম্মানে বাধছে।

তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। যে জমি বহুদিন ধরে তাঁকে প্রলুব্ধ করে এসেছে, আত্মসাৎ করবার ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যা অকস্মাৎ তাঁর নাগালের বাইরে চলে যেতে বসেছিল, সেই জমি আবার ফিরে আসবে হাতের মুঠোর মধ্যে ?

তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো অবিশ্বাস।

বঙ্কিম বললে, মামলা মোকদ্দমার ঝুঁকি নেওয়া আমি পছন্দ করি না জ্যেঠামশাই! আদালতের ধারে গেলে আমার জ্বর আসে। আমি এতদিন এখানে ছিলুম না, যা হয়েছে তার আর সংশোধন করা যাবে না। কিন্তু আমি যখন ফিরে এসেছি তখন এ সমস্ত নোংরামি আমার সহ্য হবে না। জমি যদি আপনার হয় তো আপনিই নিন!

একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে কালাচাঁদের মন উঠলো ভরে। গোবর্ধনকে নিয়ে তিনি যখন বিব্রত, মামলায় পরাজয় কি করে সহ্য করবেন সেই চিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন সেই সময় এই প্রস্তাব তাঁর হাতে স্বর্গ ধরে দিলে। মৃদু হেসে তিনি বললেন, জমি তো আমারই তুমি সেকথা না জানতে পার তোমার বাবা তো জানে। আমি কোনদিনই কারো সঙ্গে বিরোধ করতে চাইনি, তোমরাই ঝগড়া ডেকে আনলে। ন্যায় আর সত্য যখন আমার পক্ষে তখন পেছিয়ে আসব কেন, এই ভেবে আমি আদালতের সাহায্য নিয়েছিলুম। এখন তোমাদের সুবুদ্ধি হলে মামলা উঠিয়ে নিতে আমার কোন আপত্তি হবে না। তবে ভবিষ্যতে আবার যাতে বিরোধ না বাধে সেজন্য একটা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে!

—তাই হবে জ্যেঠামশাই।—বঙ্কিম হাসলে।

সেই অসম্ভব রকমের নির্বোধ যুবকের দিকে চেয়ে কালাচাঁদও হাসলেন।

তাঁর গৃহদেবতা শ্রীধরের পূজা সেদিন ষোডশোপচারে হল। ভক্তিভরে দেবতাকে প্রণাম করে তিনি তৃপ্তির হাসি হাসলেন আর মনে মনে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, এই নির্বোধ ছেলেটির জন্য দাসুর দুর্গতির আর শেষ থাকবে না।

কিন্তু সে ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি ফলে না।

বঙ্কিম তাঁকে ছাড়িয়ে গেল অল্পদিনের মধ্যেই। শুধু অর্থে নয়, আচারে, আচরণে ও আভিজাত্যে গোপালনগরে তার তুলনা রইলো না।

সে যে নির্বোধ নয় কালাচাঁদ শীঘ্রই সেকথা বুঝতে পারলেন। শুধু একটা কথা তিনি বুঝতে পারলেন না। বঙ্কিম তাঁর কাছে এসে ওরকম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে গেল কেন? তাঁর মনে এ আশঙ্কাও জেগে উঠলো যে বাড়ী বয়ে এসে যেচে জমি দান করে সে একটা কূটচাল চেলে গেল। একদিন হয়তো সে সুদ সমেত সব আদায় করে নেবে।

তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন।

বঙ্কিম গোপালনগরে এসে শশীতারাকে আবিষ্কার করেছে।

সে নিজে অন্তত সেই কথাই ভাবে। এই বিধবা তরুণীর চোখের মাদকতা তাকে করে মোহগ্রস্ত। তার সুগঠিত তনুর দিকে চেয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার রূপ তাকে আকর্ষণ করে।

সদা সপ্রতিভ বঙ্কিম শশীতারার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো নিজেকে মনে করে অসহায়।

ধারালো ছুরির মতো দীপ্ত হয়ে ওঠে শশীতারার হাসি। পানের রসে টুকটুকে তার পাতলা ঠোঁটের দিকে চেয়ে বঙ্কিম কি ভাবে সেকথা সেই জানে।

শৈশবে ও কৈশোরে যে শশীতারার সঙ্গে গোপালনগরের পথে-ঘাটে বঙ্কিম খেলা করেছে এ যেন সেই শশীতারা নয়। তার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী হৃষিকেশের সঙ্গে যে মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল এর সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এ শুধু স্বতন্ত্র নয়, সুন্দর আর বিচিত্র, যার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের না আছে সামঞ্জস্য, না আছে সঙ্গতি।

সদ্যপ্রস্ফুটিতা রজনীগন্ধার মতো সহজে বিকশিত এই তরুণীর দিকে চেয়ে বঙ্কিমের চোখের পলক পড়ে না।

ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলার সময় শশীতারা হ'ত তার বউ। সেই ডাক তার এখনো মনে পড়ে। মাঝে মাঝে যখন কেউ কোথাও থাকে না চুপি চুপি সে ডাকে, বউ?

এই সম্বোধনে শশীতারার মুখ প্রসন্ন হয়ে ওঠে না। কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে সে বলে, মুখে কি কিছু আটকায় না?

—না।—অবলীলাক্রমে বঙ্কিম উত্তর দেয়।

তার সঙ্গে কথা কয়বার সময় বঙ্কিম যায় বদলে। আত্মপ্রচারে সে অভ্যস্ত কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য সেই অভ্যাস তাকে ত্যাগ করতে হয়। তার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের রেশ ধ্বনিত হয় না। শুধু সহজভাবে সে তার সঙ্গে কথা বলে না, স্বচ্ছন্দ কথাগুলি আবেগে হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী।

গুরুতর কথা কিছু তাদের মধ্যে হয় না। যে সব কথা হয় তার অধিকাংশই বাজে কথা।

তবু এই বাজে কথাই বঙ্কিম বলে গভীর আগ্রহের সঙ্গে।

দেশে মিলিটারী এসেছে, চাষ হবে না, সেই দুর্ভাবনা থেকে তারা দুজনেই মুক্ত। সারা গ্রাম যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তখন তারা লঘু হাস্যপরিহাসে মুহূর্তগুলিকে উপভোগ করে। তাদের একজন অজস্র অর্থোপার্জন করছে আর একজন উদ্দাম একটা আবর্তের মতো গতানুগতিকতার স্রোতে জাগিয়ে তুলেছে আলোড়ন। দুজনের কেউ অতীত নিয়ে আক্ষেপ করে না অথবা ভবিষ্যতের চিন্তাবিলাসে সময়ক্ষেপ করে না। বর্তমানকে তারা উভয়েই গ্রহণ করেছে সহজে এবং পরিপূর্ণভাবে।

সমাজে তাদের কার কোথা স্থান সেই নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর তারা পায়নি। কথার গুণ টেনে লঘুছন্দে সময়ের স্রোত কেটে বয়ে চলাতেই তাদের আনন্দ।

শীতের আর্ত ও রুক্ষ বাতাস বসন্তে হয়ে ওঠে মদির আর মধুর। গোপালনগরের মাঠ পার হয়ে বহু দূর দূরান্তর থেকে ভেসে আসে সেই বায়ু সমুদ্রের লোনা জলের স্পর্শ নিয়ে। অশোকের পুষ্পিত শাখায় নেচে ওঠে পুলক হিল্লোল। সেদিকে চেয়ে বঙ্কিম বলে মৃদুস্বরে, খোঁপায় দুটো ফুল গুজলে না কেন বউ?

চাঁপাফুল রঙের শাড়ীখানা সামলাতে সামলাতে শশীতারা ফিক্ করে হেসে ওঠে। বলে, কার জন্যে আর খোঁপায় ফুল গুজব বলো?

এই কথায় বঙ্কিম যেমন দুঃখবোধ করে না শশীতারাও তেমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে না। জীবনের চলমান স্রোতে লঘুভাবে তারা যেন ভেসেই যাবে। সেখানে দাগ টানতে যাওয়া নিরর্থক সেকথা জানতে পেরে তারা সেই অসম্ভবের পিছনে ছোটা ছেড়ে দিয়েছে।

বঙ্কিম আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে গান গেয়ে ওঠে :

রাঙা ঠোঁটের বাহার কিবা হাসিতে আকুল
সন্ধ্যেবেলা কেন গো বউ এলিয়ে দিলে চুল।

শশীতারার কাছ থেকেই সে গানটা শিখেছে। কটাক্ষ করে শশীতারা তার গানের উত্তর দেয় গান গেয়ে :

বঁধু এলো সন্ধ্যে-বেলা
সুয্যিমামার রঙের খেলা
আঁধার আকাশে,
পিদিম জ্বেলে দেখি চেয়ে
বঁধূর কালো নয়ন বেয়ে
চাঁদ উঠে আসে।

তারপর দুজনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে ওঠে। ছেলেবেলার বউ-বউ খেলা যেন তারা এখনো খেলছে।

বঙ্কিম বলে, পিদিম জ্বেলে চাঁদ দেখছ বউ?

শশীতারা উত্তর দেয়, কি করি? বাঁধা খোঁপায় তুমি যে এলোচুল দেখতে পেলে?

আবার দুজনে হাসে।

বঙ্কিম মাঝে মাঝে ভাবে, শশীতারার সংস্পর্শে এসে সে যেন আর এক জগতের মানুষ হয়ে ওঠে। তার ভিতরে যে মানুষটি অহরহ জেগে থাকে সে অতিক্রান্ত হয়ে যায় পশ্চাৎপট দিয়ে। বহুদূর অতীতের স্মৃতি নিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যে অপরিচিত পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ায় অন্ত

সময় বঙ্কিম চেষ্টা করেও তার দেখা পায় না। তবু এই অপরিচিতকে তার বহুপরিচিত বলেই মনে হয়। তার আবির্ভাব তাকে শুধু পুলকিত করে না ধীরে ধীরে তার অন্তরের নিরুদ্ধ অন্ধকারকে আলোর ঝলকে তোলে উদ্ভাসিত করে। সে দেখা পায় এক অপরূপের।

সে সব ভুলে যায়। তার পাটোয়ারী বুদ্ধি, ঔদ্ধত্য আর অহমিকা যা তার আত্মপ্রচার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি তার কিছুই তার মনে থাকে না। জীবনের খোলসটাকে ত্যাগ করে সে যেন হয়ে ওঠে স্বচ্ছন্দ আর সুন্দর। অনাহত একটি আনন্দময় সুর তাকে টেনে নিয়ে চলে এক বিচিত্র সৃষ্টির রহস্যালোকে।

ছয়

গৌরীকান্তের সহযোগিতায় কৃষ্ণা কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে নেমেছে। যারা এ বছর বেকার হয়ে কাটাবে, জমি থাকা সত্ত্বেও চাষ করতে পারবে না, তারা কৃষ্ণার কথা শুনছে গভীর আগ্রহ নিয়ে। গৌরীকান্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে কি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তারা। তাদের সামনে মৃত্যুর ভ্রূকুটী। শুধু সংসার নয়, সমাজ অবধি বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এখনো সচেতন না হলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সরল আর নির্বোধ কৃষকেরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে বাস্তব অবস্থাকে। কিন্তু সেই উপলব্ধি যতই প্রখর হচ্ছে ততই তাদের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা এখন অনুভব করে। সঙ্ঘ গড়বার কাজে নেমেও পড়ে আগ্রহভরে।

আবাদের মাঠে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের উদ্ধত পদক্ষেপ তাদের চিত্তে জাগিয়ে তোলে দাহ। কর্ষিত মৃত্তিকার অসহায় কান্না তারা যেন শুনতে পায়। যে মাটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিবিড়, যে তাদের দিয়ে আসছে ফসল ও জীবনীশক্তি, রৌদ্রে আর বৃষ্টিতে যে মাটিতে তারা লাঙল দিয়েছে, বীজ বুনেছে, তাদের সমস্ত দুঃখ ও সন্তাপকে স্বর্ণশস্যে ঝলমল যে মাটি স্নেহময় স্পর্শে তুলেছে স্নিগ্ধ করে, তাকে অপরে করেছে অধিকার।

মনের অন্ধকারে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চিত হতে থাকে। যাদের অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করা হয়েছে, তাদের অসহ্য অন্তর্দাহে উৎপন্ন হয় এক ভয়াবহ

বিস্ফোরক। সকলের অজ্ঞাতসারে সেই বিস্ফোরক দিনের পর দিন হয়ে ওঠে দারুণ ধ্বংসশক্তিসম্পন্ন।

কৃষ্ণার প্রাণপণ পরিশ্রম সার্থকতার প্রথম ধাপ অতিক্রম করলে। গোপালনগরে কৃষক সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

গৌরীকান্ত একদিন এসে বললে, বিকাশদা রবিবার আসছে তোমার সঙ্ঘ দেখতে।

—রবিবার ?—কৃষ্ণার বিশাল চোখ দুটো উজ্জ্বল হযে উঠলো।

—হ্যাঁ।

—আমার এখানেই এসে উঠবে তো ?—আগ্রহভরে কৃষ্ণা তাকালো গৌরীকান্তের দিকে।

—হ্যাঁ। তোমার বাড়ীতেই উঠবে।—গৌরীকান্ত হেসে উঠলো।

এবার আর রাত্রির অন্ধকারে নয়, দিনের বেলা প্রকাশ্যে বিকাশ প্রবেশ করলে গোপালনগরে তার অ্যাটাচিকেস হাতে নিয়ে।

গোবর্ধন তাকে সব কথা বললে বিস্তারিতভাবে। থানায় তার হয়রাণি, কালাচাঁদের প্রস্তাব কিছুই বাদ দিলে না। তাকে সে সতর্কও করে দিলে, হুঁসিয়ার, একটু সাবধানে চলা-ফেরা করবে।

বিকাশ হেসে উঠলো। বললে, সাবধান হয়েই তো চলা-ফেরা করি। তবে এবার অতিরিক্ত সাবধান হতে হবে। তোমার যাতে কোন ক্ষতি না হয়।

—আমার আবার কি ক্ষতি হবে ?—গোবর্ধন বললে।

বিকাশের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্ভীক হয়ে উঠলো। কোন ক্ষতিকেই যেন সে ক্ষতি বলে গ্রাহ্য করবে না।

কৃষ্ণার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিলো না। কিন্তু সে সঙ্কোচকেও

জয় করতে পারছিল না। তার প্রাণপণ পরিশ্রমে যে সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে তাকে বিকাশ কি চোখে দেখবে কে জানে? তার জীবনের প্রথম সাধনাকে যদি সে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে?

তার আশঙ্কা অমূলক সেকথা জেনেও সে তার দুর্বলতা পরিহার করতে পারছিল না। বিকাশ একজন বড কর্মী। তার দৃষ্টিতে কৃষ্ণার কর্মপদ্ধতি ও প্রচেষ্টা কি রূপ পরিগ্রহ করবে সেই কথা ভেবে কৃষ্ণা মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছিল।

সভায় গেল সে দুরু দুরু বুকে।

কৃষকেরা আগেই এসে জড়ো হযেছিল। তাদেব কর্মঠ দেহ আর কর্কশ মুখগুলি দেখা যাচ্ছিল। রুক্ষ ও শ্রীহীন মানুষগুলি স্থির হয়ে বসেছিল একটা উদ্‌গ্রীব প্রত্যাশা নিযে। তাদের চোখের দৃষ্টিতে সম্ভ্রম আর নির্বোধ বিস্ময়।

বিকাশের সম্বন্ধে তারা অনেককিছু শুনেছে।

তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে সে আজ কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করবে। যে মুখেব গ্রাস থেকে তাদের বাঞ্চত করা হচ্ছে সেই গ্রাস কি করে মুখে উঠবে তার পথ সে দেখাবে, এমনি ধারা একটা আশা নিয়ে তারা সভায় এসেছে।

কৃষ্ণা আর গৌরীকান্তকে নিযে বিকাশ সভায় প্রবেশ করতেই তারা চঞ্চল হয়ে উঠলো। স্মিতহাস্যে বিকাশ তাদের স্থির হতে বললে। তারপর তাদের মাঝখানে বসে পড়ে নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত বললে, খবর কি বলো?

যারা তার কথা শুনতে পেলে তারা সকলেই মুখ-চাওযাচাওয়ি করতে লাগলো। অবাক হয়ে গেল তারা। তারা কি খবর বলবে? খবর বলে কোন বস্তু আবার তাদের জীবনে আছে নাকি? যে অন্তহীন দুঃখের মহাসমুদ্রে তারা নিমজ্জিত তার এক একটি ঢেউ গর্জন করে ছুটে আসে

আর তারা বিহ্বল হয়ে যায়। এই তো তাদের জীবন! এ জীবনের কথা আবার বলবে কি?

তাদের দিকে চেয়ে দেখলে বিকাশ। তাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির নীরব ভাষা সে যেন পাঠ করলে নিঃশব্দে। তারপর বললে, তোমাদের কথা কৃষ্ণাই বলুক। ও সব কথাই ভালো করে বলতে পারবে।

কৃষ্ণা একগা ঘেমে উঠলো।

গৌরীকান্ত ফিস্ ফিস্ করে তাকে বললে, আরম্ভ করে দাও!

কি আরম্ভ করবে? কৃষ্ণার রাগ হল গৌরীকান্তর ওপর। অম্লানবদনে সে বললে, 'আরম্ভ করে দাও।' কিন্তু কি এবং কিভাবে আরম্ভ করবে সে কথা সে কিছুই জানে না।

বিকাশের ওপরেও তার রাগ হচ্ছিল। এত বড সভায় তাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করা, সকলের সামনে তাকে অপ্রতিভ করা ছাড়া আর কিছুই নয।

বিকাশ তাড়া দিলে, দেরী করো না কৃষ্ণা, অনেক কাজ করবার রয়েছে।

কৃষ্ণা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো। সকলের উৎসুক দৃষ্টির সামনে সে নিজেকে মনে করতে লাগলো অসহায। ইচ্ছা হতে লাগলো সভা থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে।

—কি বলবে খুঁজে পাচ্ছ না কৃষ্ণা?—বিকাশের কণ্ঠস্বর গম্ভীর। সে বললে, কিন্তু এদের কথা তোমাকেই গুছিয়ে বলতে হবে। তুমি এদের সঙ্গে কাজ করছ, তুমি ছাড়া এদের পরিচিত করবে কে? আজ এদের ভিতর থেকে তুমি কথা বললে কাল এরাই সেই কথা আরো ভালো করে বলবে। মুখ না ফুটলে কিছুই হবে না। মনের কথা চেপে রাখলে চলবে না।

—ঝা বলেছ বাবাঠাকুর!—কৃত্তিবাস মোড়ল কথা কইলে কৃষকদের ভিতর থেকে।

—বাবাঠাকুর নই, ভাই। আমরা সকলেই সকলের ভাই।—বিকাশ বললে হাসতে হাসতে কৃত্তিবাসের দিকে চেয়ে।

গোবর্ধন কৃষ্ণাকে সাহস দিচ্ছিল পিছন থেকে, নজ্জা করিসনি। এখানে তো আর বাঘ ভালুক নেই যে খেয়ে ফেলবে! নে যা বলবি বলে ফ্যাল।

কৃষ্ণা মনে জোর করে সাহস এনে বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। তার পা কাঁপছিল। বুকের ভিতর থেকে শব্দ উঠছিল ঢিব ঢিব করে। সভার সকলের দিকে চেয়ে দেখতেও পারছিল না সে।

তার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে বিকাশ বললে, ইচ্ছা হলে তুমি বসে বসেই বলতে পারো। ঘরোয়া সভায় এমন কোন নিয়ম নেই যে দাঁড়িয়েই বলতে হবে।

জেদের বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণা কিন্তু বসল না। তার মনে হচ্ছিল আর সকলে তার কথা ভেবে মনে মনে হাসছে। কিছু বলতে না পারার লজ্জা যে তার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সেই কথা ভেবে সে অস্বস্তিবোধ করছিল। এক রকম মরিয়া হয়েই সে বলতে আরম্ভ করলে।

কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বরের মধ্য থেকে ফুটে উঠলো একটা প্রচ্ছন্ন মর্মবেদনা। প্রকাশভঙ্গী সহজ ও সাবলীল না হলেও বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠলো ধীরে ধীরে। যাদের নিয়ে সে সঙ্ঘ গড়েছে তাদের কথাই বলতে আরম্ভ করলে। সেই সব কৃষকেরা যাদের ভূমিহীন কৃষক বলা হয়ে থাকে। যারা অপরের জমিতে ফসল ফলায় প্রাণপণ পরিশ্রম করে। রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে লাঙল দেয়। মৃত্তিকাস্তূপকে কমনীয় করে তোলে। বীজ বোনে। ফসল কাটা হলে যাদের ঘরে সারা বছরের খোরাক ওঠে না। দুঃখে ও দৈন্যে যারা জর্জরিত। চিন্তায় ও ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তবু সারা বছর অর্ধাশনে কাটিয়ে, পরের জমিতে সোনা ফলিয়ে তাদের মুখে ফুটে ওঠে সাফল্যের হাসি। মাটির মালিকানা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না,

মাটিকে কর্ষণ করেই তৃপ্ত হয়। স্বর্ণশস্যে মাঠ যখন ঝলমল করে তখন তাদের দৃষ্টিতে কেঁপে ওঠে আনন্দের বিদ্যুৎ। মাটিই যাদের সাধ আর স্বর্গ, জগদ্ধাত্রী মাটিকেই যারা সত্য বলে জেনেছে, সেই নির্বোধ এবং নিঃস্ব কৃষকদের বেদনায় তার কণ্ঠ হয়ে উঠলো ভাষাময়।

বিকাশ মুগ্ধ হয়ে গেল।

কৃষকদের সে জানে। তাদের মধ্যে সে কাজ করছে। কিন্তু সেই হৃতসর্বস্বদের কথা এমন ভাবে সেও তো কখনো ভাবেনি!

কৃষ্ণা কি নতুন করে তাকে শেখালে সেই বঞ্চিতদের কথা, অপরের জমিকে উর্বরা করে তোলবার জন্য যাদের দেহের শোণিত স্বেদবিন্দুতে পরিণত হয়?

ধানের দর চড়ছে। জীবনযাত্রার আবশ্যকীয় উপকরণগুলির দামও বাড়তির মুখে। দেশে দেখা দিয়েছে একটা অস্বস্তি আর উৎকণ্ঠা। আশঙ্কার কুটিল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।

মেঘ ধীরে ধীরে পক্ষবিস্তার করছে। প্রান্তসীমায় বিন্দু হয়ে জমে সে নিজেকে বিস্তৃত করছে দিগ্বিদিকে।

বঙ্কিম ধান কিনতে আরম্ভ করলে।

যাদের ঘরে ফসল উঠেছিল চড়া দাম পেয়ে তারা সেই ফসল ছেড়ে দিতে লাগলো। টাকার দরকার সকলের, সেই যুক্তিতে টাকার দিকই তারা দেখলে।

কৃষ্ণায় কৃষকসমিতি কাজ করছিল। তারা চেষ্টা করছিল ধান যাতে কেউ না ছাড়ে। কিন্তু সেই চেষ্টায় বিশেষ ফল হচ্ছিল না। যারা সঙ্গতিপন্ন তারা বছরের খোরাক রেখে বাকী ধান বেচে দিলে। কৃষ্ণার কথা শুনলে না।

বস্তাবন্দী ধান গোরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে বঙ্কিমের গুদামে এসে সঞ্চিত হতে লাগলো।

বঙ্কিম বাধা পেলে নিঃস্ব কৃষকদের কাছে। তাদের ঘরে হয়তো দু'তিন মাসের খোরাক সঞ্চিত ছিলো। কিন্তু সেই সামান্য সঞ্চয়ও তাকে প্রলুব্ধ করলে। সে এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলে চাষীদের মন ভোলাবার জন্য। প্রচার কার্যের কৌশল সে আয়ত্ব করেছিল। সেই কৌশল সে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে চাষীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে।

কৃষ্ণা চিন্তিত হয়ে উঠলো।

সকলেই টাকার দিকে দেখছে। ধান বেচে এত দাম পাওয়ার কথা কোনদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এই সুযোগে প্রত্যেকেই অর্থোপার্জন করতে চায়। সকলেই ভাবছে একবেলা খেয়ে একবেলা উপোস দিয়ে বছরটা কাটিয়ে দেবে। টাকা উপায়ের এমন চমৎকার সুযোগ হেলায় হারাবে না। দুর্ভিক্ষ আসন্ন একথা বলেও লোককে বোঝানো যাচ্ছে না।

পাল্টা প্রচার করছে বঙ্কিম, দুর্ভিক্ষ যদি সত্যিই হয় তাহলেও কেউ না খেয়ে মরবে না। রাজা প্রজাকে দেখবে।

সুযোগ বুঝে একথাও বলছে, ভগবানের রাজ্য, কর্মফল খারাপ না হলে কি কেউ উপোস দিয়ে মরে? চিন্তামণি চিনি ঠিক যুগিয়ে যাবেন। কোন ভাবনা নেই।

সমিতির সভ্যদের জড়ো করে কৃষ্ণা এক সভা করলে।

গৌরীকান্ত সকলকে বুঝিয়ে বললে দেশের অবস্থার কথা। সমস্ত ধান গবর্ণমেণ্টের ঘরে চলে যাচ্ছে। গবর্ণমেণ্ট সেই ধান ধরে রাখছে সৈন্যবাহিনীর জন্য। দেশে আকাল হলে তার এক কণাও লোকের সাহায্যের জন্য পাওয়া যাবে না। বাজারে কাগজের নোট চালিয়ে টাকার দাম কমিয়ে দেওয়া হচ্চে। এ সময় চিন্তা করে কাজ না করলে দুর্গতির শেষ থাকবে না।

কৃষ্ণা বললে, আড়তদারদের ফাঁপিয়ে তুলে আর সরকারের ভাঁড়ারে ধান জমা রেখে গাছের পাতা খেয়ে কেউ বাঁচবে না। যে রকম করে হোক এই সর্বনাশকে পরিহার করতে হবে। মাটি গেছে, ফসল যা আছে তাও যদি যায় তাহলে আর বাকী রইল কি? নিজের পেটের ভাত পরের ঘরে তুলে দিয়ে শেষে কি সকলে মিলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

কৃষ্ণার আবেগকম্পিত কণ্ঠ শ্রোতাদের মনে প্রভাব বিস্তার করলে। তাদের চোখের সামনে সমস্যাটি ফুটে উঠলো একটি কুটিল আকার নিয়ে। বুদ্ধির আলোকে এই প্রথম তারা দেখলে সমস্যাটিকে।

—আমরা ধান দোব না। —কৃত্তিবাস বললে।

—ঝাই হোক না কেনে। —মাথা নাড়লে নিধিরাম।

—গাঁয়ের লোকগুলোকে যে বুঝ করাতে পারচি না। —রাইচরণের কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

—বঙ্কিমবাবুর মতলব খারাপ। —হরিদাস বললে।

—শুধু বঙ্কিমবাবু নয়, যারা ওইরকম করে গায়ে হাত বুলিয়ে ধান কিনছে তাদের কারো মতলবই ভালো নয়। কৃষ্ণা বললে, এখন তারা অনেক আশা দিচ্ছে কিন্তু বিপদ এলে কারো টিকিও দেখা যাবে না। এ পর্যন্ত যত ধান বঙ্কিমবাবুর ঘরে গিয়ে উঠেছে তার এক কণাও তোমাদের সাহায্যে ফিরে আসবে না। আসবে কোথা থেকে? সে সব আর নেই! চালান হয়ে গেছে।

—চালান হয়ে গেছে? —শ্রোতারা সমস্বরে বলে উঠলো।

—হ্যাঁ। চালান হয়ে গেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তাঁর আড়ত দেখে এস? একটি ধানও সেথা দেখতে পাবে না।

—ধান নেই? —সকলের মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

কৃষ্ণা বললে, না। সে ধান এখন কতদূরে গিয়ে পড়েছে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই।

তাদের মুখের অসহায় ভঙ্গীর দিকে চেয়ে রইল কৃষ্ণা। নিরাবরণ সত্যের সামনে তাদের চেতনা পর্যন্ত যেন স্তব্ধীভূত হয়ে গেছে। নিষ্ঠুর উপলব্ধি নিঃশব্দ একটা হাহাকারের মতো প্রতিফলিত হচ্ছে তাদের মুখে। ভয়াল ভবিষ্যতের কঠিন ও অন্ধকার ছায়া তাদের চোখের দৃষ্টিকে করে তুলেছে বিষণ্ণ ও বেদনাতুর।

তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

বঙ্কিম তাদের অনেক আশা আর আশ্বাস দিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, গবর্ণমেণ্ট ধান কিনলেও সে ধান দেশেই থাকবে। অভাবের সময় সেই ধান আবার ঘরে ফিরে আসবে।

দেশে শত্রুর আক্রমণ আসন্ন। তারা দেশ অধিকার করলে কারো ঘরে ধান চাল থাকবে না। সেকথা তাবা জানে। কিন্তু শত্রু যদি দেশে না আসে আর ধানও না থাকে ?

বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তারা তাকিয়ে বইল সামনে। তাদের কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো কৃষ্ণার কথা, 'মাটি গেছে, ফসল যা আছে তাও যদি যায় তাহলে আর বাকী রইল কি ?'

সত্যি ! কিছুই তো আর বাকী থাকে না। অনাহার এবং মৃত্যু তার সমস্ত কদর্যতা আর রুক্ষতা নিয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। তুষারের মতো শীতল একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে দেয় বুদ্ধি ও চেতনাকে। তাদের বুক থেকে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিশ্বাস।

কৃষ্ণাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

সভা ভঙ্গ হওয়ার পর একে একে তারা বেরিয়ে যায় রিক্ত অন্তর আর জ্বালাভরা দৃষ্টি নিয়ে। সেই দৃষ্টির দিকে কৃষ্ণা সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে। সে যে এই অগ্নিকণার সন্ধানই করছিল। বহ্নিস্ফুলিঙ্গ

সৃষ্টি করবার আকাঙ্খায় নিজেকে বহ্নিরূপীনী করে তোলবার প্রার্থনা জানাচ্ছিল ভগবানের কাছে

বিচিত্র উৎসাহে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে দাসু মুখুয্যের ধানজমি হস্তগত হওয়ার পর কালাচাঁদের আত্মবিশ্বাস হয়ে উঠল দৃঢ়। তিনি তাঁর বুদ্ধি ও কূটকৌশল নিয়োগ করলেন গৌরীকান্তের ব্যাপারে। যদি তাকে তিনি সামলে নিতে পারেন।

তাঁর কুটিল দৃষ্টি তাঁকে প্রতারিত করেছিল কি না জানিনে, কিন্তু গৌরীকান্ত তখন সামলে নেওয়ার বাইরে চলে গেছে। সেই আদর্শবাদী তরুণ যে তাঁর কৌশলজালে আবদ্ধ হয়ে পিছনে ফিরে আসবে সেরূপ একটা অসম্ভব সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে উদয় না হলেই ভালো হত।

নিখিল ভারতীয় শ্রমিক ও কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে গৌরীকান্ত নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছিল। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস সে অধ্যয়ন করেছিল নিপুণ ভাবে। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সুরু করে শ্রমিক আন্দোলনের যে তরঙ্গগুলি রাজনীতির জটিল জগতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে সফেন উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে চূর্ণ হয়ে পড়ত তার সবগুলিকে গ্রথিত করে সে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ইতিহাস গড়ে তুলেছিল। সেই ইতিহাসের অগ্রগতি কোন্ পথে হবে সে সম্বন্ধেও তার মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো। আর সেই ইতিহাস রচনা করবার আগ্রহে সে সর্বস্বপণ করে নেমেছিল কাজে।

নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা তার ছিল কিনা সে প্রশ্ন এখানে ওঠে না। কারণ সে প্রশ্ন কোনদিনই তার মনে উদয় হয়নি। তবু নেতা অপেক্ষা

কর্মী হতেই সে চেয়েছিল এবং তার প্রগাঢ় কর্মনিষ্ঠা তাদের দলের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সম্মানের আসনে।

তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি ছিলো বিস্তৃত। বিকাশ তার ওপরে সবচেয়ে কঠিন কাজের ভার দিত। সেই দায়িত্ব অক্লান্ত ও অনলস নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত গৌরীকান্ত।

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগে থেকে যে বিপ্লববাদী আন্দোলন চলে আসছিল তার ধারা কখনো ক্ষীণ আবার কখনো প্রবল হলেও, থেমে কোনদিনই যায়নি। নিত্য নব ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে সেই আন্দোলন গতিবেগ সঞ্চার করছিল দেশের আকাশে বাতাসে। একদা যে সন্ত্রাসবাদীরা মুষ্টিমেয় ছিল, রুষবিপ্লবের পরে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী গেল বদলে। দেশের অগণিত মূক জনসাধারণের সংস্পর্শে আসবার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তাদের কর্মপদ্ধতিও পরিবর্তিত হল।

গোপন কার্যকলাপও চলতে লাগলো। দেশে বিপ্লবীদের অস্তিত্ব আছে সেকথা ঘোষণা করবার প্রয়োজন হত। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার কাজও চলতে লাগলো।

দলের অন্যতম নেতা বিকাশ এই দ্বিবিধ কার্যের দায়িত্ব নিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

উনিশশ'ত্রিশ ও বত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পরে কংগ্রেস পঁয়ত্রিশ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন গ্রহণ করলে। সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বিপ্লবীরাও চুপ করে বসে রইল না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং বহু গুপ্তহত্যা সঙ্ঘটিত হল। তারপর কংগ্রেসের শাসন সংস্কার গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের গতিও প্রবল হয়ে উঠলো।

ওদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় ও উৎসাহে প্রতিক্রিয়াশীল মোসলেম লীগও মাথা তুলতে লাগলো।

এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল।

ভারতবর্ষের প্রগতিশীল দলগুলি এই মহাযুদ্ধের সুযোগ নেওয়ার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হতে লাগলো।

শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলির সঙ্গে গৌরীকান্ত সুপরিচিত। খুব বেশীদিনের কর্মী না হলেও শ্রমিক আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সে অধ্যয়ন করেছিল মনোযোগের সঙ্গে। সেই জন্যই সে শ্রমিকদের ভিতর থেকে শ্রমিক কর্মী আর কৃষকদের ভিতর থেকে কিষাণ কর্মী তৈরী করে নিচ্ছিল। সে জানত শ্রমিক ও কিষাণ কর্মী বলে যাঁরা সুপরিচিত তাঁদের সকলেই এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। এমন কি যে গান্ধীজী করাচীর বিচারে নিজেকে "উইভার এণ্ড ফারমার" বলে অভিহিত করেছিলেন তিনিও সেই সর্বহারা শ্রেণী থেকে আসেননি। তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য তাঁকে সর্বহারা হতে হয়েছিল। অনুভূতির দৃঢ়তা ও অনন্য-সাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা তিনি দেশেব কোটী কোটী মূক ও অজ্ঞ জনসাধারণের একমাত্র আত্মীয় বলে পরিগণিত হযেছেন। সারা দেশ তাঁকে পরিত্রাতা বলে মনে করে। মনের নির্জনে অর্ঘ্য দেয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার। অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অনমনীয় শাসনের নাগপাশ থেকে অসহায় দেশকে মুক্ত করবার জন্য অসহনীয় দারিদ্র্যকে বরণ করে নেওয়া! এই অবিশ্বাস্য ও কঠোর ত্যাগ-স্বীকারই তাঁকে ভারতবর্ষের একমাত্র নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই নির্মল ও উজ্জল আদর্শবাদ গৌরীকান্তকে মুগ্ধ করে। ব্যক্তিবিশেষ বা সংসারবিশেষের সঙ্গে সঙ্কীর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ না হয়ে সারা দেশকে আত্মীয় করে নেওয়ার উন্মাদনা তাকে করে তোলে ব্যাকুল। এক অভূতপূর্ব প্রসারতা তার মনে সৃষ্টি করে এক অব্যক্ত আবেগের। সে

কিষাণ আর শ্রমিকদের কাছে ছুটে যায়। তার নিজের মনের আগুনে সে তাদের উত্তপ্ত করে তোলে। কৃষ্ণাকে চুপি চুপি বলে, এক হয়ে যাও কৃষ্ণা, ওদের সঙ্গে এক হয়ে যাও। ঘৃণা নয়, সহানুভূতি নয়, অবজ্ঞা নয়, কোন প্রভেদই যেন না থাকে। যে সম্প্রীতি গড়ে উঠবে তার ভিৎ যেন না দুর্বল হয়ে যায়। ওরা যেন তোমায় আপনার বলে ভাবে।

কৃষ্ণা হেসে বলে, আমি ওদের ঘরেরই মেয়ে। আমার বাবা চাষী ছিলো। ওদের সঙ্গে আবার আমার প্রভেদ কি থাকবে? আমি তো ওদের আপনার জন?

আনন্দে গৌরীকান্তের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে বলে, সে কথা কি আমি জানি না? তবু তোমায় বলি, কোন কারণে, কখনো যেন তোমার শ্রেষ্ঠত্ববোধ ওদের না মনে মনে পীড়িত করে। ওদের আপনার করে পেয়ে আবার যেন হারিয়ে ফেলো না।

—সে ভয় তোমার নেই। তোমার চেয়ে আমি ওদের ঢের বেশী চিনি। —কৃষ্ণা উত্তর দেয়।

—চেন বলেই তো আমাদের মধ্যে তোমাকে টেনে আনার প্রয়োজন হয়েছিল কৃষ্ণা!—গৌরীকান্ত বলে। কখনো কখনো বিক্ষোভও আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে। সে বলে, আমি ওদের থেকে অনেক দূরে সেই কথাই শুধু ওরা মনে করে। ওরা নীচে আমি ওপরে সে কথা ওরা ভুলতে পারে না। আমি ধনীর সন্তান এই জন্যই ওদের কেউ নই এইটুকুই শুধু ওরা জানে।

কৃষ্ণা তাকে সান্ত্বনা দেয়, ওরা তোমায় চেনে। তোমার পরিচয় ওরা ভালো ভাবে পেয়েছে। যে সম্মান তোমাকে ওরা দেয়, সে সম্মান তোমার প্রাপ্য। এটুকু-নিতে তোমার ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়। ধনীর সন্তান বলে ওদের তুমি কেউ নও, এ কথা যদি ওরা ভাবত তাহলে তুমি ওদের সংগঠিত করতে কি করে? তোমাকে ওরা খুব নিকট বলেই মনে

করে আর দূরেও সরিয়ে রাখতে চায় না। তুমি এখনো ওদের সম্পূর্ণ চিনতে পারনি।

সবিস্ময়ে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে গৌরীকান্ত প্রশ্ন করে, সে কি? আমার চেয়ে তুমি ওদের ভালো করে চেন?

কৃষ্ণা উত্তর দেয় গম্ভীর মুখে, নিশ্চয়, আমি যে ওদেরই ঘরের মেয়ে।

গৌরীকান্ত নীরবে মেনে নেয় কৃষ্ণার এই কথা। তার শ্রেষ্ঠত্বকে সে মনে মনে স্বীকার করে। তার শক্তি সম্বন্ধে মনে পোষণ করে সীমাহীন আশা।

গোপালনগরকে কেন্দ্র করে আশে-পাশের দশ বারোখানি গ্রামের কৃষকদের সে সংগঠিত করেছে। এই সংগঠনের নেতৃত্ব করবে কৃষ্ণা। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়ার দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বিরাট একটা কলোচ্ছ্বাসে মহাসমুদ্রের সফেন তরঙ্গরাশি যেদিন উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে সেদিন খুব বেশী দূরে নয়। তার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। স্তম্ভিত মানব সমাজ পেষণে ও শোষণে পিষ্ট হতে হতে হয়ে উঠছে হতাশ। সেই হতাশার অন্তরালে দুর্জয় দুরাশায় কাঁপছে মহাজাগরণের স্পন্দন।

মহাজাগরণের স্পন্দন কালচাঁদের চিত্তে আলোড়নের সৃষ্টি করে না। করবার কোন হেতুও নেই। গৌরীকান্ত যাতে সামলে চলে সেই কামনাই তাঁর একান্ত। প্রতারণা ও দুষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে যে ধন-সম্পত্তি তিনি অর্জন করেছেন তাঁর অবর্তমানে সেগুলি হাতছাড়া হয়ে যাবে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে তিনি বিহ্বল হয়ে যান। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে যা তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন তার সব পড়বে ভেঙে, তাঁর

স্মৃতি অবহেলিত হবে মানুষের বিদ্রূপে আর করুণায় সে তিনি কি করে সহ্য করবেন ?

তিনি চূর্ণ করবেন বিকাশকে, কৃষ্ণাকে আর কৃষক আন্দোলনকে। গৌরীকান্তের সমস্ত নির্ভরগুলি সরিয়ে নিয়ে তাকে করে তুলবেন একান্ত অসহায়। তারপর পোষমানাবেন অশক্ত ও অক্ষম সন্তানকে। সে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই, শান্তি নেই।

মনে মনে পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়ে তিনি অবলম্বন করলেন নতুন পথ।

হঠাৎ বড়লোক বঙ্কিমের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁর সামনে দিয়ে দুর্বার গতিতে বঙ্কিম ওপরে উঠছে। তার প্রতিপত্তি যাচ্ছে বেড়ে। তিনি তার নাগাল ধরতে পারছেন না।

কি করে পারবেন ?

তাঁর দহরম মহরম থানার বড়বাবুর সঙ্গে। তাঁর সাহায্যে ও আনুকূল্যে তিনি বজায় রাখেন নিজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বঙ্কিম সে ধার দিয়েও যায় না। থানার দারোগাকে সে গ্রাহ্যও করে না। তার খাতির মহকুমা-হাকিমের সঙ্গে। পুলিশ সাহেব তার বাড়ীতে অতিথি হন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে করমর্দন করেন। বড় বড় মিটিং-এ তার ডাক পড়ে। সেদিন জেলায় যখন লাট সাহেব এসেছিলেন তখনও তার নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

এমন লোকের নাগাল ধরা বড় সহজ কথা নয়।

সেই জন্য ঈর্ষায় মন বিষিয়ে উঠলেও নিষ্ফল আক্রোশে মনে মনে দগ্ধ হওয়া ছাড়া তাঁর আর কিছু করবারও ছিলো না।

যতখানি সম্ভব তিনি তাকে এড়িয়ে চলতেন। সম্ভবপর ক্ষেত্রে তিনি তার ছায়াও স্পর্শ করতেন না। এজন্য তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল।

অকস্মাৎ সেই দুরবিস্তৃত ব্যবধান ছোট হয়ে এল। কালচাঁদই ছোট করে আনলেন তাকে।

বঙ্কিমের দিক থেকেও এই ব্যাপারে সাগ্রহ সমর্থন পাওয়া গেল। পুরাণো আত্মীয়তা সে একবার নতুন করে ঝালিয়ে নিলে। তার দরকারও হয়েছিল।

অর্থোপার্জন ছিলো তার জীবনের একটা নেশা। তার নানা ক্ষেত্র আবিষ্কার করে সে যেমন ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছিল তেমনি নিজেকেও করছিল চরিতার্থ। কিন্তু এই চরিতার্থতার পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যেত। সে প্রশ্ন তার মানসিক বিলাসের।

শশীতারা তার জীবনের প্রচ্ছন্ন ও অবজ্ঞাত একটা দিককে তুলেছিল আলোকোদ্ভাসিত করে।

প্রথম যৌবনে গোপালনগর ছেড়ে গিয়ে জীবনের দীর্ঘ কয়েকটা বৎসর বর্মায় কাটিয়ে জন্মভূমির জন্য সে কোন বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করত না। করবার কোন হেতুও ছিলো না। ব্যবসা করবার সুবিধা হবে বলে আর যে স্থানে মাথা নীচু করে অপরের কৃপাদৃষ্টির সামনে দিনযাপন করেছে, সেখানে ঐশ্বর্যের জাঁকজমকে লোককে চকিত আর স্তম্ভিত করে দেবে এমনি একটা অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা মনে নিয়ে সে ফিরে এসেছিল। গোপালনগরে তাদের সমাজের মধ্যে তাদের অবস্থাই ছিলো সবচেয়ে অস্বচ্ছল। শৈশবের ও কৈশোরের কঠোর দারিদ্রের স্মৃতি মনকে রেখেছিল বিষাক্ত করে। সেইজন্যই অর্জিত সম্পদের সহায়তায় প্রথম জীবনের স্মৃতিকে মুছে ফেলবার বাসনা তার ছিলো।

সে সম্পন্ন ব্যক্তি সেই পরিচয় নিয়েই সে ফিরলো। সেখানকার লোক তার দিকে চেয়ে পুরানো বঙ্কিমের কোন চিহ্নই দেখতে পেলে না। সর্বপ্রযত্নে পুরাতনকে চুণকাম করে বঙ্কিম হয়ে উঠলো নতুন। দম্ভে ও অহঙ্কারে আর ব্যয়ে ও ব্যসনে গড়া তার ব্যক্তিত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ

করলে। খ্যাতি ও অখ্যাতি সমভাবে বর্ষিত হল তার শিরে। তার জীবনযাপনের রীতি ও পদ্ধতির স্বাতন্ত্র গোপালনগরে সাড়া জাগিয়ে তুললে।

কিন্তু এক জায়গায় তার আবরণ গেল খসে। সকলকে উপেক্ষা করলেও সে শশীতারাকে এড়িয়ে যেতে পারলে না।

তার শৈশবের সঙ্গিনী শশীতারা। হৃষিকেশের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল। বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে সে তাকে দেখলে। তার বৈধব্যের শ্রীহীনতা তাকে আঘাত করলে।

সেই শশীতারা! যাকে পিঠে নিয়ে সে সাঁতার কেটে পুকুর পার হত। যার জন্য জামরুল পাড়তে উঠে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে সে দু'মাস বিছানায় পড়েছিল। তার দাগ এখনো পিঠে আছে।

সেই শশীতারার কাছে নতুন করে নিজেকে পরিচিত করতে কোথা বাধলো। কতকটা আত্মবিস্মৃতের মতোই সে বলে ফেললে, কিরে বউ? কেমন আছিস্?

সেখানে তখন আর কেউ ছিলো না। তবু শশীতারার মুখ আরক্ত হয়ে উঠলো। অস্ফুটকণ্ঠে সে বললে, যাঃ কি বলছ?

নির্জনতার মধুর পরিবেশে পূর্ণযৌবনা বাল্যসখীর দিকে তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল বঙ্কিম। তার আরক্ত মুখে, পেলব ওষ্ঠাধরে জীবনের অপূর্ব কামনা যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বঙ্কিমের যেন নেশা ধরে গেল। একপাশে একরাশি কামিনী ফুল ফুটেছিল। তার সৌরভ যেন শশীতারারই দেহের সুবাস। সেই সুবাস তাকে রোমাঞ্চিত করে তুললে।

সেদিন থেকে শশীতারা হল তার জীবনের আর এক নেশা। অর্থোপার্জনের নেশার সঙ্গে এই নেশার কোন সম্পর্ক নেই। মনের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন এই মধুর নেশা তাকে মাতাল করে তুললে।

অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য তার দরকার হত নানাভঙ্গী, নানাভাবের। কিন্তু এই নেশাকে চরিতার্থ করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অচরিতার্থতায় তার আনন্দ! অতৃপ্তির আকুলতার মধ্যেই যেন তার সমস্ত রোমাঞ্চ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

একটা অব্যক্ত বেদনায় তার হৃদয় স্পন্দিত হতে লাগলো।

কিন্তু গ্রামের লোকের চোখে তার এই আচরণ প্রীতিকর হল না। এই নিয়ে নানা কথার আলোচনা হতে লাগলো।

মানুষের কল্পনা সত্যকে অতিক্রম করে গেল।

এমনকি কৃত্তিবাস মোড়ল একদিন এসে তাকে বলে গেল, গাঁয়ে তো আর কাণ পাতা যায় না বাবু! আমি গরীব, আমায় যেন মেরো না।

—তোমাকে মারব কি মোড়ল?—স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সঙ্গে বঙ্কিম উত্তর দিলে, কে কি বলছে বল না? দিই তাকে ঠাণ্ডা করে।

—ঠাণ্ডা আর কতজনকে করবে। —কৃত্তিবাস ম্লান মুখে হাসলে।

বঙ্কিম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তোমার ভয় নেই। আমার দ্বারা কোন ক্ষতি তোমার হবে না। তোমার বাড়ীতে যাই, দুদণ্ড বসি, সেজন্য তোমার কোন অনিষ্ট করব এত বড় বেইমান আমি নই।

—আমি কি সেকথা বন্নু?—কৃত্তিবাস জিভ কাটলে।

—না তা বলনি!—বঙ্কিম উত্তর দিলে, সব সময় মনের কথা তো মুখে প্রকাশ করা যায় না? তাতে বিপদ আছে। সেইজন্যই আগে থেকে আমি তোমায় ভরসা দিচ্ছি যাতে মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করতে না হয়।

কৃত্তিবাস আশ্বস্ত হল। শশীতারার সঙ্গে তার কতখানি মাখামাখি সেকথা সে জানত না। তার অনুপস্থিতিতেই বঙ্কিম তাদের বাড়ী যাতায়াত করত। কদাচিৎ তাদের কথাবার্তার মাঝখানে সে এসে পড়লেও কোন অস্বাভাবিক আচরণ তার চোখে পড়েনি।

বঙ্কিমের কাছে সে এসেছিল গ্রামের লোকের আলোচনায় বিরক্ত হয়ে। তাকে অসন্তুষ্ট করবার ইচ্ছা তার ছিলো না। ইতিমধ্যেই তার কাছ থেকে তাকে সাহায্য চাইতে হয়েছে। ভবিষ্যতেও সাহায্য পাওয়ার ভরসা সে রাখে। শুধু তাই নয়, বঙ্কিম তাকে আশা দিয়েছে তার কাঠের গোলায় একটা চাকরী দেওয়ার। চাকরীটার জন্য সে মনে মনে প্রলুব্ধ হয়ে আছে। ঘরে আর মাস দুইএর খোরাক মাত্র আছে। চাষও বন্ধ। গ্রামে এমন কেউ নেই যে কারো কাছে গিযে চাইলে কিছু পাওয়া যাবে।

তাছাড়া বঙ্কিমকে অসন্তুষ্ট না করবার আরো একটি কারণ ছিলো।

শশীতারা তার বড় আদরের মেয়ে। অল্প বয়সে মাতৃহারা এই মেয়েটিই ছিলো তার সংসারের একমাত্র অবলম্বন। আকস্মিক বৈধব্য সেই অবলম্বনটিকে স্নেহ ও বাৎসল্যের বাহুল্যে অভিষিক্ত করত প্রতিক্ষণে। শশীতারাকে সুখী করবার জন্য যে কোন অসম্ভব কাজ সে করতে পারত হাসিমুখে।

কৃত্তিবাস আশ্বস্ত হলেও বঙ্কিম অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

তার আর শশীতারার সম্পর্কটা খুব খারাপ ছিলো না বহুদিন পরে গ্রামে ফিরে এসে স্মরণের কূল থেকে তার বাল্যসখীকে আবিষ্কার করে সে যেমন আনন্দিত হয়েছিল তেমনি গর্বও বোধ করেছিল। যৌবনের কামনা দিয়ে সে চাইত তার বাল্যসখীর সাহচর্য। তার সুগঠিত দেহের মধ্যে তরুণ রক্তের যে উত্তপ্ত স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তার প্রাখর্য করত তাকে আবিষ্ট। দেহের লীলায়িত ছন্দে মন হয়ে উঠত উন্মনা। সাময়িকভাবে কখনো কখনো শশীতারার রক্তমাংসের দেহটার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেও উপভোগ-স্পৃহা তার মনকে কোনদিনই ছায়াচ্ছন্ন করেনি। সত্যসত্যই সে ছিলো তার মানসিক বিলাস। অর্থোপার্জনরত একটি পরিশ্রান্ত ও উপবাসী চিত্ত শশীতারার সাহচর্যে যেন সুস্থ হয়ে উঠত।

এইজন্যই সম্পর্কের অপব্যাখ্যা সে সহ্য করতে পারলে না।

ঠিক এই সময় কালাচাঁদ তাঁর নিজের প্রয়োজনে দূরত্বের ব্যবধানকে ক্রমশই ছোট করে আনছিলেন।

চতুর বঙ্কিম জানত তার বিরুদ্ধবাদী গ্রামের লোকের আন্দোলনের মূলে আছে কালাচাঁদের প্ররোচনা। জীবনে কোনদিন কোন সুযোগই সে হারাযনি। সুতরাং কালাচাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে তার দেরী হল না।

সাত

বসন্তের পর গ্রীষ্ম।

গোপালনগরের বায়ুপ্রবাহ হয়ে উঠলো বেগবান। রৌদ্রের তাপে সেই বাতাস হয়ে উঠলো অগ্নিময়। পিঙ্গলবর্ণ আকাশে নিরাশ্বাস উষরতার দাহময় স্পর্শ হয়ে উঠলো করাল। বনস্পতির সবুজের স্বপ্ন গেল ভেঙে। প্রকৃতি হয়ে উঠলো রুক্ষ।

ফলভারে আম্রবৃক্ষগুলি অবনত হয়ে পড়লো। মাঠের উদাস হাওয়ায় ঝলসে-যাওয়া পাতাগুলো কেঁপে উঠতে লাগলো, আর দুলতে লাগলো গাছের শাখাপ্রশাখা। গোপাল-নগরের মানুষগুলি অলস হযে বসে রইল না। তাদের কেউ বুনতে লাগলো বেতের চুপড়ি, কেউ বা তৈরী করতে সুরু কবলে সুতোর জাল। কিন্তু তাদের কর্মোদ্যম শিথিল আর নিস্তেজ হযে রইল। মাঠে লাঙল দেওয়ার কঠিন পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি পেয়ে তাদের কেউ আনন্দবোধ করলে না। বরং রৌদ্রতাপে দগ্ধ অকর্ষিত ভূমির দিকে চেয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলো। একটা অভাববোধ তাদের পীড়িত করতে লাগলো অহরহ।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা হাফপ্যাণ্ট পরে শুধু গায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো গ্রামের ভিতরে। দুঃসহ গ্রীষ্মে তাদের অস্বস্তি যত বাড়তে লাগলো ততই তারা হয়ে উঠলো বেপরোয়া। সাঁতার কাটবার জন্য একটা প্রকাণ্ড দীঘি তারা ঠিক করে নিলে আর সেই দীঘিতেই কাটাতে লাগলো দিন। আমগাছগুলো তাদের অত্যাচারে দুদিনেই ফলহীন হয়ে উঠলো। ডাব, নারকেল কোন কিছুই তারা বাদ দিলে না।

মিলিটারী ভ্যানের আনাগোনা গেল আরো বেড়ে। বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে প্রত্যহ একখানি বিমান এসে নামতে লাগলো। শত্রু বিমানের আবির্ভাব সংবাদ শুনতে পাওয়ার জন্য একটি যন্ত্রও বসানো হল। সেখানে দিনরাত দেখা যেতে লাগলো কর্তব্যরত সৈনিকদের।

গোপালনগরের যে অংশ তারা অধিকার করেছিল সেই অংশ উঠলো সহর হয়ে। বসতি অঞ্চল বাদ দিয়ে গ্রামের বাকী সমস্তই তারা নিয়ে নিয়েছিল। সুবিধা, সুযোগ এবং প্রয়োজনমতো অধিকৃত ভূভাগকে তারা তুললে গড়ে।

প্রশস্ত পথ, গ্যাসের আলো আর জীবনযাত্রার আড়ম্বর গোপালনগরের মানুষগুলির চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। নির্বোধ দৃষ্টি মেলে নির্বাক বিস্ময়ে তারা চেয়ে থাকত সেই উৎসবময় জীবনের দিকে। দিনযাপনের সমারোহে যেখানে অপরিমেয় ঐশ্বর্য উপচে পড়ছে।

আম, জাম, লিচু আর জামরুল বিক্রী করে কেউ কেউ আশাতীত লাভও করলে। তাদের তুলনায় এই শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা যে কতখানি নির্বোধ সেকথা তারা সবিস্তারে বর্ণনা করতেও ভুললে না। চার আনা দামের জিনিষ কিনতে গিয়ে অনায়াসে তারা একটা টাকা ফেলে দেয়। ভুলেও একবার দরদস্তুর করে না।

তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা গ্রামবাসীরা শুনলে অন্তহীন বিস্ময় ও কৌতুহল নিয়ে। অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও এই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো।

একদিকে জীবনযাত্রার অপরিমিত আয়োজন আর একদিকে বঞ্চিত জীবনের অদ্ভুত দৈন্য, বিপরীতমুখী এই দুটি স্রোত বয়ে চলল গোপালনগর দিয়ে।

জাপানীদের বর্মা অধিকার করার কথা গ্রামবাসীরা শুনলে। গোপাল-নগর থেকে বঙ্গোপসাগর খুব বেশী দূরে নয়। তারা শঙ্কিত চিত্তে

আলোচনা করতে লাগলো প্রত্যাশিত বিমান আক্রমণের। সমুদ্র পার হয়ে জাপানীরা যদি এখানে এসে হানা দেয় সেই চিন্তাও তাদের মনে আন্দোলিত হতে লাগলো। অদ্ভুত আর হাস্যকর গুজবে চতুর্দিক উঠলো মুখর হয়ে। সম্ভাবিত বিমান আক্রমণের জন্য কাটা স্লিটট্রেঞ্চগুলো তাদের মনে জাগাতে লাগলো আতঙ্ক আর কৌতূহল। কয়েকদিন সাইরেনও বাজলো।

গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে প্রচারিত হচ্ছিল বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের পদ্ধতি। গোপালনগর রোড ষ্টেশনে শোভা পেতে লাগলো বহু সচিত্র পোষ্টার। এ-আর-পি সংগঠিত হল।

বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ! ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ফিরে গেছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আপোষ হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। দক্ষিণপন্থী নেতারা পর্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। তাঁদের বিবৃতি ও বক্তৃতায় যেসব কথা প্রকাশ পাচ্ছে ধৈর্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েই মানুষ সেই ধরণের কথা বলে থাকে।

গোপালনগরের বায়ুপ্রবাহে ভেসে আসতে লাগলো সেই সব কথার উত্তাপ। তার সঙ্গে বাস্তব সমস্যা ভয়াবহ আকার নিতে লাগলো। খাদ্যাভাবের কথা ভেবে মানুষের ধমনীর রক্ত হয়ে উঠছিল শীতল।

আশঙ্কা আর উদ্বেগ দিনগুলিকে কুটিল করে তুললে। চরম দুর্ভাগ্যের ভয়াল আভাস আকাশ ও বাতাসকে করে তুললে নিরানন্দ। মানুষগুলি ক্লান্ত হয়ে উঠলো। তাদের সম্মান মর্যাদা ও অস্তিত্ব সমস্তই উঠলো বিপন্ন হয়ে।

আর গোপালনগরের দিগন্তবিস্তৃত মাঠগুলো ছেয়ে গেল তাঁবুতে। বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো প্রস্তুত করে রাখা হল সর্বসময়ের জন্য। আকাশে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করতে লাগলো পাহারারত বিমান।

দিনের বেলা গ্রামবাসীরা কৌতূহলী হয়ে চেয়ে থাকত আকাশে। রাত্রিতে নিদ্রাঘোরে শিউরে উঠত বিমানের গম্ভীর গুঞ্জনে।

কৃষ্ণার কর্মের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। তার দৃষ্টিভঙ্গীও গেছে বদলে। তার চিত্তের তারে ঝঙ্কার তোলে এক উদার ও বলিষ্ঠ সুর। তার স্বভাবগত সেই কুণ্ঠা কোথা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যে তীব্র অশান্তি তাকে অহরহ পীড়িত করত অন্তহীন শূন্যতা নিয়ে তার দাহ থেকে সে মুক্ত।

এ সে কৃষ্ণা নয় যে বিকাশের সম্বন্ধে পুলিশ অনুসন্ধান করছে শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। থানা থেকে গোবর্ধনের ডাক এসেছে শুনে উৎকণ্ঠা গোপন করতে পারেনি। এ কৃষ্ণার চোখে পড়েছে দুর্বার সাহসের নিঃসঙ্কোচ রুদ্রমূর্তি। সত্যের অবিনাশী ও অনির্বান বহ্নিশিখা। বন্ধুর পথ তাকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি।

দরিদ্র চাষীদের কাছ থেকে সে পাচ্ছে আশাতীত সমর্থন। নিঃস্ব ও রিক্তদের সচেতন করে তোলবার যে গুরুদায়িত্ব সে গ্রহণ করেছে সেই দায়িত্বপালন করবার পথে তার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা এই সমর্থন লাভ।

আজকাল একদল লোক তাকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। আর একদল চেয়ে থাকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে। একদল তাকে দেয় অযাচিত আশ্বাস। অপরদল কিন্তু তাকে এড়িয়ে চলে। তার দিকে চেয়ে দুদলই ফিস্‌ফাস্ করে নিজেদের মধ্যে করে আলোচনা। সে জানে সেই আলোচনাকারীদের একভাগ কামনা করে তার সাফল্য আর একভাগ তার বিরুদ্ধে।

জনমতের মধ্যে দুটি ভাগ যে হয়ে গেছে সেই চিন্তা তাকে ব্যথিত করে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের প্রভাবিত করবার প্রয়াসও তার ব্যর্থ হয়। কালাচাঁদ আর বঙ্কিমের বিষচক্র জনমতের একটি অংশকে করছে

নিয়ন্ত্রিত। সেই নিপুণ নিয়ন্ত্রনের সম্মুখে কৃষ্ণার উদ্যম হয়ে ওঠে অকার্যকরী।

সম্পন্ন ও মধ্যবিত্তদের সঙ্গে এই দলে কয়েকজন দরিদ্র চাষীও যোগ দিয়েছে। তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নেওযা হচ্ছে। সাময়িক লাভের প্রলোভনে আর ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায তারা ডেকে আনছে সকলের সর্বনাশ।

কৃষ্ণার ব্যক্তিত্ব প্রখর ও স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই দলটির কাছ থেকে সে লাভ করছে নিন্দা ও বিদ্রূপ। তাদের দলের বহু গোপন সংবাদও পৌঁছে যাচ্ছে বিরোধী দলের কাছে। এ কাজ কে করছে সে তা বুঝতে পারছে না। গৌরীকান্ত অনবরত তাকে বলছে, বিশ্বাসঘাতককে খুজে বার করো কৃষ্ণা।—কিন্তু সে কিছুতেই জানতে পারছে না কে বিশ্বাঘাতকতা করছে।

কৃষক সমিতির সভ্যদের এক সম্মেলন হয়ে গেল।

চালের দাম বাডছে, আর তারা দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে। তারা ভাবলে সম্মেলন হয়তো তাদের পথের সন্ধান দেবে।

বামুনপাডা আর দাসপাডার মধ্যবর্তী মাঠে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কলকাতা থেকে বিকাশ এল কযেকজন কর্মীকে নিয়ে।

জোরালো স্পষ্টভাষণে বিকাশ কৃষকদের বললে, না খেয়ে মরা চলবে না। গভর্ণমেণ্টকে চাল দিতে বাধ্য করতে হবে। না দিলে আমরা কেড়ে খাব। গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য চাল নেয় নিক, কিন্তু আমাদের অংশ আমাদের দিতে হবে। নিরন্নেরা কলকাতায় যেতে আরম্ভ করেছে। পথে আস্তানা নিয়ে তাদের কেউ কেউ পথেই মরছে। মরার সংখ্যা এখনো কম, কিন্তু খুব শীগগীর সেই সংখ্যা বাডতে সুরু করবে। হাজারে হাজারে তারা মরবে না খেয়ে। তাদের অনুনয় আর আর্তনাদ মানুষকে বিচলিত করলেও পথের সন্ধান তাদের কেউ দিতে পারবে না। যতক্ষণ দয়ার

প্রত্যাশায় তারা দোরে দোরে হাত পেতে বেড়াবে ততক্ষণ না পাবে খুঁজে বাঁচবার মন্ত্র আর না মিলবে মুখের গ্রাস। বাঁচবার অধিকার আছে একথা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত কেউ বাঁচবে না।

সমস্বরে কৃষকেরা সমর্থন করলে বিকাশকে। তার কথায় তাদের সুষুপ্ত মর্যাদাবোধ উঠলো জেগে।

আবেগময় কণ্ঠে বলতে লাগলো বিকাশ, এই বাঁচবার মন্ত্র তোমরা ছড়িয়ে দাও লক্ষ লক্ষ লোকের কাণে। তারা তোমাদের সঙ্গে দাবী জানাক মিলিত কণ্ঠে। তাদের বাঁচবার অধিকার স্বীকৃত হয়ে যাক। এই স্বীকৃতির জন্য যদি মৃত্যু আসে তো আসুক। জীবন তাতে সার্থক হবে। যে মরবে, সে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে মরুক। উপবাস করে তিলে তিলে মরার চেয়ে সে মৃত্যু বাঞ্ছনীয়।

একটা উগ্র উত্তেজনায় সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কৃষ্ণা তাদের জ্বালাভরা চোখগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। যাদের অন্তরের দাহ চোখের দৃষ্টিতে দুর্বার হয়ে উঠেছে তাদের দ্বারা কি বিশ্বাসঘাতকতা সম্ভব?

কৃষকদের কণ্ঠে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিকাশের কথা, "যে মরবে, সে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করে মরুক।"

আশ্বাসে কৃষ্ণার বিশাল চোখের দৃষ্টি হয়ে ওঠে বিচিত্র।

সভার বিস্তৃত সংবাদ কালাচাঁদ আর বঙ্কিমের কাছে পৌছুল।

গোপালনগরে একশ্রেণীর লোক কি ভাবে চিন্তা করছে তার পরিচয় পেয়ে উভয়েরই বিস্ময় সীমাহীন হয়ে উঠলো। "গভর্ণমেণ্টকে চাল দিতে বাধ্য করতে হবে। না দিলে আমরা কেড়ে খাব।" এই সমস্ত কথা সহ্য করা অসম্ভব বলে মনে হতে লাগলো।

কালাচাঁদ ছুটলেন থানার বড়বাবুর কাছে। বঙ্কিমও গেল মহকুমা হাকিমের বাংলোয়।

যুগের দাবীকে স্বীকার করতে হয়। অস্বীকার করবার সাহস ও সঙ্কীর্ণতা যাদের থাকে তারা যে ঐরাবতের মতো স্রোতের বেগে ভেসে যায় সে কথা ঐতিহাসিক সত্য। তবু সেই সত্যকে অস্বীকার করে এমন ব্যক্তিরও অভাব নেই। ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয। দম্ভ, সঙ্কীর্ণতা আর কূটবুদ্ধি নিয়ে বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষও অনিবার্যকে নিবারণ করবার প্রাণপণ প্রয়াস করে। অপ্রতিরোধ্যকে প্রতিরোধ করতে প্রলুব্ধ হয়। কালাচাঁদ আর বঙ্কিম তো তুচ্ছ।

কর্তৃপক্ষমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তাঁরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

কৃষকসমিতির নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। তাদের গতিবিধির ওপরেও আরোপ করা হল বাধা। কৃষ্ণা আর গৌরীকান্তের ওপর হুকুম জারী হল গৃহের চতুঃসীমার বাইরে যেন তারা পা না দেয়। কোন সভাসমিতিতে যোগদান না করে। প্রত্যহ যেন থানায় উপস্থিত হয়।

গৌরীকান্তের চাকরীটিও গেল।

জনগণের মধ্যে একটা সন্ত্রস্ত ভাবের সৃষ্টি হল। স্তম্ভিত ও ভারাক্রান্ত চিত্তে তারা করতে লাগলো চলাফেরা। তাদের প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ হতে লাগলো ধূমায়িত। কর্তৃপক্ষের সতর্কদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল তাদের ওপর।

যুদ্ধরত গভর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টি! কৃষ্ণার সংগঠিত কৃষকসমিতি সেই তীব্র দৃষ্টির দাহে ভস্ম না হয়ে যায়!

কিন্তু দুর্বল ও ক্ষুদ্র কৃষকসমিতি সেই রোষদৃষ্টিতে বিচলিত হল না। গোপালনগরের অধিবাসীরা আশঙ্কা আর উদ্বেগ নিয়ে সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলো। ইতিমধ্যেই সমিতি তাদের অন্তরে প্রভাব

বিস্তার করেছে। সমিতি লুপ্ত হয়ে যাক এ কামনা কেউ করে না। সমিতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বহু লোকেও তার কল্যাণ কামনা করে।

তারা যেমন আশ্চর্য হল, পুলকিতও হল তেমনি। কোথায় পেলে কৃষকসমিতি এই দুর্বার প্রাণশক্তি?

যাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল তারা সেই সব বিধিনিষেধ মান্য করে চলতে লাগলো। এমন কি কৃষ্ণা এবং গৌরীকান্তের দিক থেকেও আইন অমান্য করবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস দেখা গেল না। কিন্তু সমিতির কাজও চলতে লাগলো সুশৃঙ্খলভাবে। নেতৃস্থানীয় যে ক'জনকে সন্দেহভাজন বলে মনে হয়েছিল কর্তৃপক্ষ তাদের ওপরই আরোপ করেছিলেন বিধিনিষেধ। যারা নেতৃস্থানীয় নয় এর পরে তারা যে তৎপর হয়ে উঠবে সম্ভবত সেকথা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি।

কৃষক সমিতির কাজ তখন গোপালনগর ছাড়িয়ে বিস্তারলাভ করেছে চতুঃসীমান্তবর্তী অন্যান্য গ্রামগুলিতে। সেই সব গ্রামেও মিলিটারীর তাঁবু পড়েছে। সেখান থেকেও মিথ্যা প্রচারের দ্বারা চাল কেনা হচ্ছে। অন্নাভাবে সেখানকার লোকও ক্লিষ্ট।

সমুদ্রের উপকূল থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত সৈন্যাবাস। প্রত্যেক গ্রামেই তাদের ঘাঁটি। তাদের সুখ সুবিধার সমস্ত আয়োজন করে দেওয়া হয়েছে বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে, নির্বিচারে। তার জন্য জনসাধারণের সম্পত্তি, জীবন বা সম্মান কোন কিছুই গ্রাহ্য করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের মর্যাদারক্ষা এবং প্রয়োজনের সময় এদেশবাসীর জীবন সম্পত্তি ও সম্মান, ধর্ম সংস্কৃতি ও আচার অসঙ্কোচে পদদলিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ, আফগান যুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগ বারংবার সেই কথা সপ্রমাণ করেছে। সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের জঘন্যতম পুনরাবৃত্তি সুরু করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

আট

পানের রসে ঠোঁট দুটি রাঙিয়ে শশীতারা ছিলো বসে। গ্রীষ্মের দীর্ঘ অপরাহ্ণ এলিয়ে পড়েছে আকাশের বুকে। সন্ধ্যার ছায়া নামছে ধীরে।

গুনগুন করে গান করছিল সে আপন মনে। মাঠের হাওয়া এসে দাওয়ার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আর দুলে দুলে উঠছিল তার সবুজ শাড়ীর আঁচল। খসে পড়ে যাচ্ছিল পিঠ থেকে বারংবার। বেণীবদ্ধ চুলগুলির মধ্য থেকে দু'চারগাছি চোখে আর কপালে এসে পড়ে অনর্থকই তার সুন্দর ভ্রূ-দুটিকে কুঞ্চিত করে তুলছিল। কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ ছিলো না। সে গান গাইছিল একাগ্র হয়ে, একটি মনোহর ভঙ্গীতে বসে।

শাঙন রাতে বান এল রে
নিরালা মোর ঘরে,
বঁধুর ছবি ভেসে গেছে
মন কেমন করে
ওরে, মন কেমন করে।

বহুবার সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছিল গানের এই লাইনগুলি।

তার কণ্ঠ মধুর। সেই মাধুর্যের সঙ্গে একাগ্রতা যুক্ত হয়ে সুরের স্পর্শে যেন মুক্ত করে আনছিল প্রচ্ছন্ন এক গভীর বেদনাকে তার অন্তর থেকে।

আগড় ঠেলে ভিতরে এসে বঙ্কিম বিস্মিত হয়ে গেল।

শশীতারা তন্ময় হয়ে গান গাইছে। কোনদিকে তার লক্ষ নেই। তার কণ্ঠ থেকে ক্ষরিত হয়ে পড়ছে সুরের মুক্তধারা।

পা টিপে টিপে বঙ্কিম ভিতরে এসে দাঁড়ালো তার পিছনে।

শশীতারা গাইছিল :

অঝোরে যে ঝরছে বাদল,
আকাশ ভরে বাজছে মাদল,
ঝমঝমাঝম সুরেতে তার
বুক উঠছে ভরে।
ওরে, মন কেমন করে।

বঙ্কিমের স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হয়ে উঠলো। গানটি সে আগেও শুনেছে। তবে শশীতারার কণ্ঠে নয়। এই গান গাইত হৃষিকেশ। শশীতারার মৃত স্বামী।

হৃষিকেশ বঙ্কিমের বন্ধু ছিলো। স্কুলে এক শ্রেণীতেই পড়ত তারা। স্কুলে হৃষিকেশের সুনামও ছিলো ভালো ছেলে বলে। সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে বৎসর প্রথম হওয়াতে দাসপাড়ার মাহিষ্যদের মধ্যে আনন্দের যে উচ্ছ্বাস উঠেছিল সেকথা বঙ্কিমের আজো মনে পড়ে।

হৃষিকেশ ছিলো স্বভাবকবি। সে অনেক গান রচনা করেছিল।

তার রচিত বহু গান বঙ্কিম শুনেছে।

কিন্তু শশীতারার কণ্ঠে হৃষিকেশের রচিত গান সে এই প্রথম শুনলে। সে শশীতারাকে বিয়ে করেছিল ভালোবেসে সেকথাও বঙ্কিম জানত।

এই গান কি হৃষিকেশই শশীতারাকে শিখিয়েছিল?

আশ্চর্য কি? সত্য সত্যই যখন শ্রাবণ নামত তাদের কুটিরে, আকাশ মুখর করে নেমে আসত দ্রুতগতি জলধারা, ঝম, ঝম, ঝম! বিদ্যুতের শিখায় আলোকিত আর চমকিত হত দিঙ্মণ্ডল, বজ্রের গুরু গর্জনে চকিত হয়ে উঠত সৃষ্টি, কোন দূর বনে পেখম মেলে ধরত ময়ুর-ময়ূরী, হুরু হুরু রবে ডেকে উঠত দেয়া, কদম্বকেশরের বুকে জাগত রোমাঞ্চ, তখন হয়তো

হৃষিকেশের কোলে মাথা রেখে এমনি একাগ্র আর তন্ময় হয়ে এই শশীতারাই গাইত, "ওরে, মন কেমন করে !"

হৃষিকেশের হাতে একতারা তুলত একটানা আওয়াজ।

হঠাৎ বঙ্কিমের অন্তর উদ্বেলিত করে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘনিশ্বাস।

শশীতারা চমকে পিছনে ফিরে তাকালে। বিস্ময়াবিষ্ট চোখে সে বললে, ওমা, কতক্ষণ এসেছ?—লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো তার মুখ। তাড়াতাড়ি সে বেশবাস সংযত করে নিলে।

বঙ্কিমের সেদিকে দৃষ্টি ছিলো না। সে ভাবছিল, সত্যসত্যই সুখী ছিলো হৃষিকেশ। শ্রাবণের বর্ষণমুখর রাত্রিতে, নিরালা নির্জন ঘরে রূপসী শশীতারার টানা চোখের যে মদালস দৃষ্টি দেখে সে মুগ্ধ হত, তার সুঠাম ও সুগঠিত তনুর তটপ্রান্তে উন্মত্ত কামনার যে তরঙ্গভঙ্গ দেখে সে আবিষ্ট হত, তার কালো আর কুঞ্চিত অজস্র কেশদামকে প্রশস্ত ঋজু ও মসৃণ পিঠে ভেঙে পড়তে দেখে যে বিস্ময় তার বিচিত্র হয়ে উঠত তার প্রকাশ কি পরিপূর্ণ হয়ে উঠত একতারার একটানা ধ্বনিতরঙ্গে? মোহ, আবেশ আর বিস্ময়মিশ্রিত একটা আশ্চর্য সুরের ঝঙ্কার!

শশীতারা বললে, কি ভাবছ?

—কিছু না।—বঙ্কিম উত্তর দিলে। কিন্তু সে ভাবতে লাগলো। হৃষিকেশের কাছে শিক্ষা না পেলে শশীতারার রুচি এমন মার্জিত হল কি করে? কথাবার্তার এই শোভন ভঙ্গিমা সে কোথা থেকে আয়ত্ব করলে? আশ্চর্য, এতদিন সে লক্ষ করেনি যে কৃত্তিবাসের কথায় টান আছে কিন্তু শশীতারার বাচনভঙ্গী পরিষ্কার।

গোপালনগরের বহু মাহিষ্য মেয়েকে সে দেখেছে। তাদের এমন মধুর ভঙ্গিমা নেই, মার্জিত রুচি নেই, শোভন বাচনভঙ্গী নেই।

হৃষিকেশের শিক্ষা বিনা একি সম্ভব হত?

—কি হয়েছে আজ তোমার?—শশীতারা প্রশ্ন করলে।

বঙ্কিম একবার ভাবলে যে সে জিজ্ঞাসা করে শশীতারাকে, তোমার কি হয়েছে? কিন্তু কি ভেবে সে নিজেকে সংযত করে নিলে। হেসে শুধু বললে, কই, কিছু তো হয়নি।—আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তার হাসি ম্লান হয়ে উঠলো।

—অন্যদিন তো তোমায় এত অন্যমনস্ক মনে হয় না?

—তুমি নিজেই যে আজ অন্যমনস্ক বউ?—কথাটা বলেই বঙ্কিম স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'বউ' কথাটা তার কানে খট্ করে বাজলো। কাকে সে 'বউ' বলে ডাকছে? হৃষিকেশের বউকে? এতদিন এ কথাটা তার মনে হয়নি। ছেলেবেলার বউ-বউ খেলার সাথীকে বউ বলে সম্বোধন করবার কোন দাবীই আজ তার নেই। একদা যে তার খেলাঘরের বউ হত তাকে বউ বলে ডাকা যে শুধু অন্যায় নয় অপমান করা এই রূঢ় চিন্তার আঘাতে সে মুহূর্তমধ্যে বিমূঢ় হয়ে গেল।

শশীতারা হৃষিকেশের বউ এই কথাটাই শুধু সে বারবার ভাবতে লাগলো। হৃষিকেশ জীবিত অথবা মৃত সে প্রশ্ন এখানে ওঠে না। সে তার বউ। শশীতারার এই পরিচয়।

শশীতারা বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিল বঙ্কিমের দিকে। তার এমন অস্বাভাবিক আচরণ আর কখনও সে দেখেনি। মনে মনে তার অভিমানও হচ্ছিল। বঙ্কিম তাকে অবহেলা করছে। তবু সে একবার বললে, আমি সত্যিই অন্যমনস্ক ছিলুম। তুমি কখন এসেছ দেখতে পাইনি।

শশীতারা ভেবে পাচ্ছিল না যে এমন কি অপরাধ সে করেছে? হঠাৎ তার মন আজ উদাস হয়ে উঠেছিল। রাজ্যের বিষাদ ঘিরে ধরেছিল তাকে। কিছু ভালো লাগছিল না। সমগ্র অন্তর বয়ে একটা বেদনার স্রোত হয়ে উঠছিল উতল আর উচ্ছল।

তার মাঝে মাঝে এইরকম হয়। একটা অস্বাভাবিক বেদনায়

কখনও কখনও সে আকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন স্থানে সে নির্বাসিত। একটা ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা তার প্রাণশক্তিকে দিচ্ছে পঙ্গু করে। তার একাকীত্ব হয়ে ওঠে অসহনীয়।

তখন সে গান গায়। হৃষিকেশের রচিত গান।

সে অন্যমনস্ক ছিলো। তার এই স্বীকৃতি কিন্তু বঙ্কিমকে আরো অশান্ত করে তুললে। একটা বিরক্তিবোধ প্রভাব বিস্তার করলে তার অন্তরে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে বললে, দেখতে পাওনি তো হয়েছে কি ?

এবার শশীতারার রাগ হল। সে তার নিজের আচরণে কোন অন্যায় বা অসঙ্গতি খুঁজে পেলে না। মানুষের মন সবদিন সমান থাকে না। দুঃখ কিংবা আনন্দ একটা না একটা নিয়ে সে থাকেই। তাছাড়া এমন কোন কথা নেই যে নিজের সুখ দুঃখের প্রশ্ন বাদ দিয়ে বঙ্কিমের মনোরঞ্জনের জন্য তাকে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে !

বঙ্কিমের কথার উত্তরে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বললে, হয়নি কিছু।—তার ঠোঁট ফুলে উঠলো। টানা চোখ ভরে গেল জলে। তবু সে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলে। বঙ্কিম না চোখের জল দেখতে পায়।

বঙ্কিমের সেদিকে দৃষ্টি ছিলো না। একটা নিদারুণ অন্তর্দাহে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার আচরণ যে সঙ্গত ও শোভন হচ্ছে না সে বোধশক্তি থাকা সত্ত্বেও সে আত্মসংবরণ করতে পারছিল না।

হঠাৎ তার আর শশীতারার মাঝখানে দেখা দিয়েছে ব্যবধান। যে ব্যবধানের কথা সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। তাদের উভয়ের মধ্যে অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে একজন মৃত ব্যক্তি। অন্ধকারে তার দীর্ঘ ও অসাড় দেহটার অস্পষ্ট ছায়ামাত্র দেখা যাচ্ছে।

সেই দৃশ্য বিরক্তিকর।

একটা 'মমী', বঙ্কিম ভাবছিল, মৃত্যুর শীতল আর অস্বস্তিকর স্পর্শ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনের দেশে। তার অপ্রীতিকর আবির্ভাব

বিষাক্ত করে তুলেছে পৃথিবীকে। আনন্দময় পৃথিবী মুহূর্ত মধ্যে পরিত্যক্ত জনপদের মতো হয়ে উঠেছে অসহ্য।

তার দুচোখ জ্বালা করে উঠলো। সে আর দাঁড়ালো না। শশীতারাকে কিছু না বলেই আগড় ঠেলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

নির্বাক বিস্ময়ে শশীতারা তার দিকে চেয়ে রইল।

গভীর রাত্রি। সৃষ্টির নির্জনতম মুহূর্তে তীক্ষ্ণদৃষ্টি তারকার দল পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে আবেগ আর আগ্রহ নিয়ে। অনন্ত প্রসারিত অন্ধকার হয়ে উঠেছে রহস্যময়।

সেই রহস্য গভীর হয়ে উঠলো গৌরীকান্তের ঘরে। অন্ধকারে মৃদুকণ্ঠে সে বললে, এইভাবে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মানুষ কি করতে পারে? ঘরের বাইরে পা বাড়াবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে থেকে আমি যে অমানুষ হয়ে উঠব? কাজ যাদের আদর্শ তাদের বন্দী করে রাখবার মতো কঠিন শাস্তি আর কিছু নেই। আর সেই শাস্তির মধ্যে জঘন্যতম শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমাকে। এর চেয়ে জেল হওয়া ভালো ছিলো।

কৃষ্ণার মৃদু হাস্যধ্বনি শোনা গেল। সে বললে, আমার কথা ভুলে গেলে নাকি? না, শাস্তি ভোগ করতে করতে নিজের যন্ত্রণাকেই শুধু বড় করে দেখলে?

গৌরীকান্ত ঈষৎ লজ্জিত হল। নিম্নকণ্ঠে সে বললে, আমার অনুভূতির কথাই শুধু আমি বলছিলুম। তুমি যেন কিছু মনে করো না। তোমার শাস্তি আমার চেয়ে লঘু সেকথা আমি ভাবব এতবড় স্বার্থপর আমি নই। আমরা সকলেই সমান যন্ত্রণা ভোগ করছি কৃষ্ণা। তবে একাকী থাকার ফলে নিজের যন্ত্রণার তীব্রতার কথাই শুধু মনে হয়। সেইজন্যই 'আমি' কথাটা ব্যবহার করেছি।

—কিন্তু বিকাশদা কি বলছিল জান? —কৃষ্ণা বললে।

—বিকাশদা এসেছিল? —সাগ্রহে গৌরীকান্ত প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ এসেছিল। —সে বললে, সত্যিকারের কর্মীকে কে আটকে রাখবে? এমন কোন বন্দীশালা পৃথিবীর কোন শাসকশক্তি তৈরী করতে পারেনি যেখানে প্রকৃত কর্মীকে আটকে রাখা যায়। খুঁজে দেখ ইতিহাস। মাইকেল কলিন্স জেল থেকে বিপ্লবীদের বার করে আনবার সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। আইরিশ গেরিলাদের সাইকেল রাতের পর রাত চলে। কৃষকেরা তাদের দেয় আশ্রয়। ম্যাকসুইনি আর যতীন দাসের দেহটাকেই শুধু বলদর্পীরা আটকে রাখতে পারে। আত্মাকে পারে না। ট্রটস্কির শ্লেজগাড়ী সাইবেরিযার তুষার মরু অতিক্রম করে আসে। লেনিন শত্রু দেশের ভিতর দিয়ে গিয়ে সীমান্ত পার হয়ে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তির সতর্ক দৃষ্টির সামনে দিয়ে চলে যান সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে। বিপ্লবীরা চিরমুক্ত। তাদের বন্দী করে কে?

গৌরীকান্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলো, বিকাশদার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পেরেছি কৃষ্ণা! এই সোনার খাঁচা ভেঙে এতদিন আমি পথে বেরিয়ে পড়তুম। শুধু শৃঙ্খলাবোধ মেনে চলার জন্য আমাকে নিরুপায়ের মতো পড়ে থাকতে হয়েছিল। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছিলুম মনে মনে, বিকাশদার নির্দেশ পাওয়ার জন্য। দলীয় শৃঙ্খলা না মেনে উপায় নেই। নচেৎ বহু আগেই আমি সৃষ্টি করে নিতুম আমার মুক্তির পথ। বিকাশদা আর কি বললে কৃষ্ণা?

—বললে—শান্তকণ্ঠে কৃষ্ণা বলতে লাগলো, বিপ্লবীকে ভাবাবেগে চঞ্চল হলে চলবে না। বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সে পথ ভয়ঙ্কর। সেই ভয়ঙ্কর পথ অতিক্রম করবার দুঃসাহসই যে শুধু তার থাকবে তা নয়, আরো অনেক কিছু চাই। বিপ্লবী কাজ করে দুর্নিবার কর্মপ্রেরণায়। মস্তিষ্ক

আর হৃদয় যোগায় তাকে অসাধ্য-সাধনের শক্তি। তার অন্তরে যে অগ্নি-শিখা অনির্বান জ্বলে সেই শিখা শুধু তাকে পবিত্রই করে না সৃষ্টিছাড়া আর ছন্নছাড়াও করে। বিপ্লবীর জীবন একটা আদর্শ। পৃথিবীতে এমন মহত্তম আদর্শ আর কিছু নেই।

গৌরীকান্ত স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, সত্যি। কিন্তু পৃথিবীতে এদের প্রয়োজনও হয় স্বাভাবিক কারণে। গীতার "সম্ভবামি যুগে যুগে"র মতো এদের আবির্ভাবও অনিবার্য। এদের বজ্রকঠোর আর কুসুমকোমল চরিত্র পৃথিবীতে শুধু বিস্ময়ের সৃষ্টিই করে না, পৃথিবীকে পুনর্গঠিতও করে। এদের ভিতর থেকে বিবেকানন্দ শোনান, 'মাভৈঃ'। গান্ধীজী বলেন, 'সত্যম্'। সৃষ্টি সে কথা কাণ পেতে শোনে। পরম আর চরম উপলব্ধির মতো জগৎ গ্রহণ করে সেই বাণী।

আপনার মনেই কৃষ্ণা বললে, চমৎকার।

গৌরীকান্ত হেসে বললে, কিন্তু আমরা যে তাঁদের পায়ের নখের যুগ্যি নই কৃষ্ণা? এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের কথা বাদ দিয়ে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কথায় এস। বিকাশদা তোমায় কি নির্দেশ দিলে? তুমি আমার এই নির্জন কারাকক্ষের স্তব্ধতা বিঘ্নিত করে হঠাৎ এখানে আসায় আমি যতখানি আনন্দিত হয়েছি ঠিক ততখানিই শঙ্কিত হয়েছি। এ দুঃসাহসের কাজ কেন তুমি করলে?

—দুঃসাহসের কাজ তো আমরাই করব?—কৃষ্ণা বললে।

—তা করবে জানি। কিন্তু নিজেরও সতর্কতার অন্ত থাকবে না। পুলিশের গুপ্তচরের সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তোমায় এখানে আসতে হয়েছে, আবার তোমায় ফিরে যেতে হবে তাদের প্রতারিত করে তোমার নিজের খাঁচায়। সেখানেও পুলিশের চর আছে। এতগুলো বাধা অতিক্রম করে যাওয়া যে অসম্ভব!

—অসম্ভবই যদি হয় তাহলে তাকে সম্ভব করবার বৃথা চেষ্টা যদি না করি ?

—তার মানে ?—গৌরীকান্ত বিস্মিত হল কৃষ্ণার কথায়। কিন্তু পরক্ষণেই উল্লাসে তার চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠলো। উৎসুককণ্ঠে সে বললে, ওঃ, কি বোকা আমি ? এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি যে তুমিও খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছ। ওঃ, আমার নিজের গালে নিজের চড় মারতে ইচ্ছা করছে।

—থাক, অতটা অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই। —কৃষ্ণা হাসলে। বললে, বোকা তুমি নও। নিজের চিন্তায় এত ব্যস্ত ছিলে আর নিজের যন্ত্রনা এত অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে আমার কথা চিন্তা করবার অবকাশ পাওনি। কেমন এই কথাই কি সত্যি নয় ?

—আমায় ক্ষমা কর কৃষ্ণা ! —গৌরীকান্ত বললে, তোমার কথার খোঁচা আমায় বিঁধছে। কিন্তু বিশ্বাস করো যতদিন এই ঘরে আমি বন্দী আছি ততদিন প্রতিমূহূর্তে তোমায় স্মরণ করেছি। তোমার কথা চিন্তা করা বর্তমানে আমার সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

গৌরীকান্ত'র কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠলো। সে বলতে লাগলো, হঠাৎ তুমি এলে। সেই আকস্মিকতাকে সহ্য করে নিতে না নিতে শোনালে বিকাশদার কথা। এর পর তোমার কথা শোনা ছাড়া আমার আর কি করবার ছিলো ? কিন্তু তুমি জান না কৃষ্ণা, যে আনন্দ তুমি আমায় দিয়েছ, খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাওয়ার নির্দেশ তুমিও পেয়েছ এই কথা ইঙ্গিতে জানিয়ে, তার শতাংশের একাংশ আনন্দও তুমি পেতে না, আমার মুখে তোমার কথা শুনে। হয়তো আজ ছাড়া আর বলবার সময় পাব না। সেইজন্যই বলি, তুমি জাননা তোমার নাম আমি জপ করি আরো শুনে রাখো, তোমার সান্নিধ্যে আসার আনন্দের জন্য আমি পৃথিবীর সমস্ত দুঃখকে বরণ করে নিতে রাজী আছি।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে গৌরীকান্ত বললে, একথা তুমি কোনদিনই জানতে পারতে না। কিন্তু আজকের এই অভাবনীয় পরিবেশে বন্ধমুক্তিকেই যখন আমরা দুজনে বরণ করছি তখন অন্তরের রুদ্ধ কথাগুলিকে মুক্ত করে দেওয়াই সঙ্গত মনে করলুম।

কৃষ্ণার মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠলো কি না বোঝা গেল না। কিন্তু গৌরীকান্তের অসঙ্কোচ আত্ম-উদ্ঘাটনে সে বিব্রত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ সে কথা কইতে পারলে না।

কৃষ্ণার সঙ্কোচ গৌরীকান্তও অনুভব করছিল। সে বললে, ক্ষমা করো কৃষ্ণা। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম। নচেৎ কোনদিনই এসব কথা শুনতে পেতে না। এখন বল বিকাশদা আর কিছু বলেছে কি না।

প্রসঙ্গান্তরে আসতে পেরে কৃষ্ণা যেন বেঁচে গেল। তবু তার কণ্ঠ থেকে কুণ্ঠা গেল না। কম্পিতকণ্ঠে সে বললে, বলেছে 'যে জীবন তোমরা কামনা করছ বন্দী-জীবনের চেয়েও সে জীবন আরো অসহনীয়। পথে তোমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে নিঃস্ব আর নিঃসহায় হয়ে, পুলিশ তাড়িয়ে ফিরবে, রাস্তার কুকুরগুলোকেও নিজেদের চেয়ে ভাগ্যবান বলে মনে হবে। শয়নে আর জাগরণে কারো এক মুহূর্তের স্বস্তি থাকবে না, সদা সর্বক্ষণ একটা গুরুভার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে পিছন দিকে তাকিয়ে। একটা অভিশপ্ত আত্মার মতো তোমরা ছুটে বেড়াবে দিগ্বিদিকে, লোকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করবে, কথা কইতে দ্বিধা করবে, সঙ্গী হতে শঙ্কিত হবে। একমাত্র আদর্শ ছাড়া তোমাদের সম্বল আর কিছু থাকবে না। এর পরেও যদি আকাঙ্ক্ষা হয়, তবেই এই জীবনের পথে পদক্ষেপ করো!'

গৌরীকান্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, এর পরে তোমার কি বলবার আছে কৃষ্ণা?

—আমি কি বলব? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমি পথে বেরিয়ে পড়েছি? —অসহিষ্ণুকণ্ঠে কৃষ্ণা বললে।

—ঠিক!—গৌরীকান্ত হাসলে। বললে, তুমি যে এত বাধা অতিক্রম করে আমার এখানে এসেছ এবং এখান থেকে আর ফিরবে না সেকথা আমার মনেই ছিলো না। বিকাশদার কথার তুমি কোন উত্তর দিয়েছ কিনা আমি তা জানি না, তবে আমি হলে তাকে এই উত্তর দিতুম, যে বেদনা আমার মনে তীব্র হয়ে উঠেছে সেই বেদনাই সৃষ্টি করবে আমার কর্মপদ্ধতি। তারই তাড়নায় আমি চলব। এজন্য সাবধানবাণী উচ্চারণ করা নিরর্থক।

—তাহলে আর দেরী করা চলবে না। —কৃষ্ণা বললে।

—আমি তৈরী কৃষ্ণা! —গৌরীকান্ত হাসলে। বললে, যাত্রা করবার মুহূর্তে সৃষ্টির বেদনা যাঁদের স্রষ্টা করেছে, অপরিসীম ত্যাগস্বীকার আর দুঃখবরণ করে যাঁরা নিজেদের আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের উদ্দেশে নমস্কার করি। বিপ্লবী মাত্রেই অসাধারণ, সাধারণ মানুষ তাঁরা নন, তা খ্যাত কিংবা অখ্যাত যাই হোক। এমন লোকও এই পৃথিবীতে আছেন যাঁদের অগ্রগামী চিন্তাধারার পরিচয় মানুষ বহু বিলম্বে পাবে। তখন সেই চিন্তাবীর হয়তো এই পৃথিবীতে থাকবেন না। থাকবে ইতিহাস। মানুষের দম্ভ, নির্বুদ্ধিতা আর অজ্ঞতার ইতিহাস! তাঁদের সকলের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলো আমরা এই নতুন পথে পদক্ষেপ করি।

গৌরীকান্ত কৃষ্ণার হাত ধরলে। বললে, উত্তরের বাগান দিয়ে যাবো কৃষ্ণা। ওই পথটাই নিরাপদ।

কৃষ্ণা হাত সরিয়ে নিলে না। মৃদুস্বরে বললে, ওই পথ দিয়েই আমি এসেছি।

গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপে মাঠ ফুটিফাটা হয়ে গেছে। অকর্ষিত মৃত্তিকা শুষ্ক হয়ে উঠেছে অবহেলায়। কৃষকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে। তাদের মনে ঘনিয়ে ওঠে ম্লান বিষণ্ণতা। কি একটা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে অন্তরে।

যত দিন কাটে তারা ততই হতাশ আর বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে। শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের দিকে তারা তাকায় জ্বালাভরা চোখে। অন্ধ বিদ্বেষে মন হয়ে ওঠে বিষাক্ত।

সৈনিকদের দুর্ব্যবহার সেই বিদ্বেষ ও তিক্ততা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অভাব তাদের করে তোলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

একটা কালো ছায়া গোপালনগরের আকাশের অবারিত উদারতাকে করে আচ্ছাদিত। অস্বচ্ছন্দতা আর নিরাশায় মানুষগুলি হয়ে ওঠে অসহিষ্ণু। বিষাদ-মলিন পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিন কাটে অধিকতর বিরক্তিকর সম্ভাবনার আতঙ্ক নিয়ে।

এতদিন অভাবের জ্বালাই ছিলো। সে জ্বালার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুলিশের অত্যাচার। কৃষ্ণা আর গৌরীকান্তের আত্মগোপন করবার পর থেকে কৃষক সমিতির ওপর পুলিশের জুলুম অসহনীয় হয়ে উঠেছে। গ্রেপ্তার আর থানাতল্লাসী নির্যাতন আর জুলুম সকলকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

কৃষ্ণার কাছে সমস্ত বিবরণই আসছে। সে আত্মগোপন করে আছে গোপালনগরের কাছাকাছি আর একটি গ্রামে। সেখানেও তার সংগঠন কাজ করছে।

বিকাশ তাকে বলেছে, মনে রেখো কৃষ্ণা, এই দেশের মেরুদণ্ড হল কৃষকেরা। তাদের সচেতন করে তোলাই হবে তোমার কর্তব্য। যে ভূমি কর্ষণ করবে ফসলে থাকবে তার অধিকার। সেই হবে মাটির মালিক। এই নীতিকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যুদ্ধ চিরদিন

থাকবে না। একদিন সৈনিকেরা ফিরে যাবে গৃহাভিমুখে মাঠ থেকে তাঁবু উঠিয়ে। তার মধ্যেই হয়তো দেশে আসবে বিপ্লব। সেই বিপ্লবের আগেই কৃষক সমাজকে সচেতন করে তুলতে হবে। তারা যেন তাদের দাবী আদায় করে নেওয়ার জন্য উদ্যত হাতে তখন এগিয়ে যেতে পারে। এতদিন যে ভাবে চলে এল সে ভাবে যে আর চলবে না সে কথা তারা যেন উপলব্ধি করে। বিপ্লব অনিবার্য একথা আমরাও জানি আর গভর্ণমেণ্টও জানে। কিন্তু সেই বিপ্লবের পরে ক্ষমতা নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি চলবে তখন তারা যেন না ঘুমিয়ে থাকে বা তাদের যে সমস্ত তথাকথিত হিতৈষী মাটি ফুঁড়ে অকস্মাৎ গজিয়ে উঠবে তাদের দ্বারা প্রতারিত না হয়। বিপ্লবের পরেও দেশে একটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরেই যেমন মহামারীর হয় প্রাদুর্ভাব। তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।

কৃষ্ণা ভাবে বিকাশের কথাগুলো। সে তার সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত করেছে কৃষকদের সচেতন করে তোলবার জন্য। আবেগ এবং ভাব-প্রবণতা পরিহার করে সমিতি যাতে স্বীয় আদর্শ অনুসরণ করতে পারে সেই প্রয়াসই সে করে আসছে।

আবেগ এবং ভাবপ্রবণতা অনেক সময় সঙ্ঘকে নিয়ে যায় তার লক্ষ্যের বিপরীত দিকে একথা বিকাশ তাকে বলেছে।

কিন্তু তার সাধনা ক্রমেই যেন এক সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। সে লক্ষ করছে কৃষকেরা যত দিন যাচ্ছে ততই যেন হতাশ আর বিরক্ত হয়ে উঠছে। কোন কিছুই তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারছে না। তারা চায় উগ্র উত্তেজনা। বিক্ষুব্ধ অন্তরকে বিভ্রান্ত করে রাখবার জন্য তারা চাইছে সর্বনাশের নেশায় মেতে উঠতে, যার উৎস আবেগ আর ভাবপ্রবণতা।

স্রোত প্রতিকূল তবু সে চেষ্টা করছে নৌকার হাল দৃঢ় হাতে ধরে রাখবার জন্য।

সেদিন গোবর্ধন বলে গেছে যেসব চাষীরা বঙ্কিমকে ছ'টাকায় ধান ছ'টাকায় বিক্রী করেছিল সেই ধান তারা ঘটি বাটি বেচে ষোল টাকা দরে কিনছে।

সংবাদটা শুনে পর্যন্ত সে অস্বস্তিবোধ করছে।

আরো একটা খবর সে শুনেছে। ভয়ানক খবর! গোবর্ধন বলেছে, কৃত্তিবাস লোকটা বেইমান। দলের সমস্ত গোপন খবর সে তার মেয়েকে দিয়ে বঙ্কিমকে জানায়। বঙ্কিম তাকে তার গোলায় চাকরী দিয়েছে।

কৃত্তিবাস বিশ্বাসঘাতক? কৃষ্ণা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী বলেই সে তাকে জানত। কথাটা সহজে বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছা হল না। সন্দিগ্ধ চিত্তে সে বললে, তুমি ভুল করনি দাদু?

—ভুল!—গোবর্ধন হেসেছিল, উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমি কারো নামে দুর্নাম দিই না।

—খুব সাবধান! আর কোন খবর সে যেন জানতে না পারে। —কৃষ্ণা বলেছিল।

—সেদিকে যথেষ্ট সাবধান হয়েছি। —গোবর্ধন উত্তর দিয়েছিল, সকলে তার ওপর যেরকম চটেছে তাতে আর কিছু না ঘটে যায়।

কৃষ্ণা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, আর কিছু ঘটলে চলবে না দাদু। আমি তাহলে তোমায় দায়ী করব। এই সময় রাগের মাথায় একটা সর্বনাশ ঘটিয়ে বসো না যেন! সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে এড়িয়ে চলো! আর কিছু না হয় যেন।

গোবর্ধন হেসেছিল। বলেছিল, কৃত্তিবাসকে না হয় সামলালুম। কিন্তু কতদিক দেখব বল? বঙ্কিম আর কালোবামুনের ওপরেও সকলে রেগে আগুন হয়ে আছে। রাগ তো নয় যেন বারুদ! একটি দেশালাই কাঠির ওয়াস্তা।

—সবদিক সামলাতে হবে! এসময় ওরকম কিছু করা মানেই সর্বনাশ ডেকে আনা। সেকথা মনে রেখো।

—মনে তো রাখব। কিন্তু আমার কথা কেই বা শুনছে। —রাগে গজগজ করতে করতে গোবর্ধন চলে গিয়েছিল।

এই অবস্থাকে কি করে আয়ত্বে আনবে সেই কথাই কৃষ্ণা চিন্তা করছিল।

জৈষ্ঠের শেষ। দাব-দাহ হয়েছে দুঃসহ। উন্মত্ত বাতাস সোঁ সোঁ করে ছুটে আসে তীব্র বেগে। মধ্যাহ্নে তার পরশ অগ্নিময়। রাত্রিতে মধুর।

রাত্রিতে দাওয়ায় বসে কৃষ্ণা ভাবে আকাশ পাতাল। অসীম ও অনন্ত ছায়াপথে তারকাদের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি প্রদীপ্ততর হয়ে ওঠে। চাঁদ আকাশের একপ্রান্ত দিয়ে উঠে নেমে যায় আর এক প্রান্তে। বিনিদ্র চোখে সে চেয়ে থাকে। অটল ও নিঃশব্দ অন্ধকার জমাট বাঁধে তার মনে।

অনেক কথা তার মনে পড়ে। অতীত জীবনের কথা। দুঃখমোচনের সঙ্গে দিন-যাপনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো। প্রথম যৌবনের সলজ্জ এবং মধুর বধূ-জীবনের কাহিনী। সীমাবদ্ধ জ্ঞান আর সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি জীবনের যে দিনগুলিকে করত নিয়ন্ত্রণ। স্বামীর আর সংসারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন প্রার্থনা উচ্চারিত হত গ্রাম্যপ্রথায় ভীরু কণ্ঠ থেকে। মঙ্গলশঙ্খ প্রতি সন্ধ্যায় মুখর হয়ে উঠত কুটীরে। তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে সে প্রণাম করত অজ্ঞাত দেবতাকে শ্রী, সমৃদ্ধি আর সম্পদ কামনা করে। অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে হাতের নোয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে দুলে উঠত আশঙ্কা।

সেদিন আজ কোথায়? দুর সম্পর্কের দেওর লক্ষণ তাকে অপহরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের এক অধ্যায়ের শেষ হয়ে গেল। আরম্ভ হল আর একটী অধ্যায়। জীবন রুদ্ররূপে হেসে উঠলো।

পুরানো আশা, আকাঙ্ক্ষা আর সংস্কার ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। প্রাচীন একটা ছবি যেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তার রঙ গেল চটে। ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে এল।

বর্ণ-সমারোহে বিচিত্র হয়ে উঠলো আর এক নতুন ছবি। অভিনব এক জগতের দ্বার তার চোখের সামনে গেল খুলে। সেই জগতের পথযাত্রীদের পদধ্বনি তাকে করে তুললে উৎসুক আর কৌতুহলী। অবশেষে সেই জগতের পথে সেও করলে পদক্ষেপ।

পুরানো জগৎ থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে যখন সে নতুন জগতের সীমান্তে এসে দাঁড়ালো তখন তার চিত্ত ভরে উঠেছিল অশান্তি ও বেদনায়। অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কিছুই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারেনি। তার পিছনে ছিলো ধ্বংসস্তূপ আর সম্মুখে অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে সে সীমান্ত করলে অতিক্রম। সহসা এক ঝলক আলোর স্পর্শে সে উঠলো চকিত হয়ে। সেই আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার অন্তরে।

তারপর সে অতিক্রম করেছে অনেকখানি পথ। নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে প্রীতি আর শ্রদ্ধা নিয়ে। তবু পুরানো জগতের রঙচটা বিবর্ণ ছবিটা বিস্মৃতির অন্ধকার যবনিকা ভেদ করে মাঝে মাঝে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। দুঃখমোচনের খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি কণ্টকিত আবলুষ-কালো মুখখানা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে সেই দিনগুলো, শান্ত আর নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রা।

কিন্তু মনে মনে কি নির্মম আর কঠিনই না সে হয়ে উঠত, জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দুঃখমোচনের সেই কথাগুলো যখন তার মনে পড়ত, 'যে পরিবার বেরিয়ে গেছে তাকে নিয়ে আবার ঘর করব কি ?'

দারুণ ক্রোধে সে জ্বলে উঠত। তার বিশাল চোখে জেগে উঠত বহ্নিজ্বালা। সেই বহ্নির স্পর্শ থেকে কেউ পরিত্রান পেত না। না দুঃখমোচন না লক্ষণ। না প্রথা না সংস্কার।

নরকের ঢাকনি তার সামনে খুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই দুঃসহ নরক থেকে তাকে উদ্ধার করেছে দেবদূত বিকাশ।

সত্যসত্যই সে দেবদূত। কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধায় তার চিত্ত আপ্লুত হয়ে ওঠে।

তার বর্তমান জীবন বিকাশেরই দান।

সে তাকে শিখিয়েছে জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। মানুষকে প্রথমে আয়ত্ত করতে হয় স্থৈর্য ও ধৈর্য। তার থেকে সঞ্চারিত হয় শক্তি। শক্তিমানের দৃঢ় ও অকম্পিত পদক্ষেপ, নিঃশঙ্ক ও দুর্জয় চিত্ত, সার্থকতাকে করে আনে আহ্বান।

একটি ইস্পাত-দৃঢ় কঠিনতা তার কমনীয় অন্তরকে করে তুলেছে শক্তিশালী। কৃষকদের নৈরাশ্য আর বিরক্তি সে সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ করে আর চিন্তা করে কি ভাবে সেই নৈরাশ্য আর বিরক্তিকে রূপান্তরিত করা যায় আশাবাদ আর বিরামবিহীন উদ্যমে।

নয়

সেদিন বঙ্কিমের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেও শশীতারা তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। সে আবার কবে আসবে সেই প্রত্যাশায় সে ছিলো।

কিন্তু একদিন দুদিন করে কয়েকদিন কেটে গেল। বঙ্কিম এল না। শশীতারা বিচলিত হয়ে উঠলো। সবচেয়ে অসুবিধা তার এই হল যে, সে আদৌ বুঝতে পারলে না, সেদিন বঙ্কিম ওরকম ব্যবহার কেন করলে আর তার যাতায়াত বন্ধ করবারই বা হেতু কি?

একটা অজ্ঞাত প্রহেলিকার সমাধান খুঁজতে গিয়ে সে অধীর হয়ে উঠলো।

ব্যাপারটা কৃত্তিবাসেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে একদিন বললে, বঙ্কা ছোঁড়াটা আর আসে না কেনে?

—কি জানি। —শশীতারা উত্তর দিলে মুখ ভারী করে।

—তুই কিছু বলিসনি?

—বলব আবার কি? —শশীতারা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, বড়লোকের মর্জি, জাননা?

—জানি। —কৃত্তিবাস গম্ভীর হয়ে উঠলো।

তার গাম্ভীর্যের হেতু যথেষ্ট আছে। বঙ্কিমের গোলায় সে কাজ করছে। কাজ বিশেষ করতে হয় না কিন্তু প্রতি মাসে মাইনে বলে যে টাকা হাতে এসে পড়ে তার মোহ অনেকখানি। তার ওপর চাল পাওয়ারও সুবিধা আছে।

উপায় সে মন্দ করছে না, আর করছে অনায়াসে। অনেকের ঈর্ষা—

কুটিল দৃষ্টি তার গায়ে বেঁধে। তার অবস্থা যে বর্তমানে স্বচ্ছল সেকথা গ্রামের কারো জানতে বাকী নেই।

এই স্বচ্ছলতাটুকু সে হারাতে রাজী নয়। আজীবন অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে সে সুদিনের মুখ দেখেছে। তাই তার চিত্ত সদা সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকে পাছে সেই পুরানো দিন আবার ফিরে আসে।

বঙ্কিম তার বাড়ীতে এলে সে আগে বিরক্ত হত। গ্রামের লোকে পাঁচ কথা বলত বলে সে একদিন তাকে সাবধান করতেও গিয়েছিল। কিন্তু আজ বঙ্কিমের অনুপস্থিতির কারণ নির্ণয় করতে না পেরে অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠলে।।

গ্রামের লোকের সমালোচনার ভয় সে আজ করে না। বঙ্কিম পাছে বিরূপ হয়ে ওঠে এই তার ভয়। উদ্বিগ্ন হয়ে সে ভাবে শশীতারা বঙ্কিমের সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেনি তো? কিন্তু শশীতারাকে সেকথা জিজ্ঞাসা করতেও তার সাহস হয় না। মনে মনে সে শুধু দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়।

গ্রামের আবর্তসঙ্কুল জীবনধারা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে চলেছে বয়ে। সেই কল্লোলমুখর স্রোত বিপন্ন গ্রামবাসীদের কোন দুর্নিরীক্ষ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সে তা ভেবেই পায় না। সে শুধু চায় না এই স্রোতে সেও ভেসে যাক। একটু নিরাপদ আরাম আর সামান্য স্বচ্ছন্দতা যে তার কাছে কতখানি সেকথা শুধু সেই জানে। জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত আর ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার উদ্যম ও সাহস কিছুই অবশিষ্ট নেই।

শশীতারার কিন্তু এ চিন্তা নেই। তার একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। জীবনকে সে লঘুভাবে নিয়েছে। জীবনধারণের দুশ্চিন্তা তার নেই।

তার মনের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে বঙ্কিম। কিন্তু তার হেতু কি? সেই কথাই সে বারংবার ভাবে। বঙ্কিমের চোখে যে

জ্বালা সে দেখেছিল তার উদ্ভব কোথায় সেই প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত হয় মনে মনে।

ইতিমধ্যে গ্রামে পর পর কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল।

গৌরীকান্ত আর কৃষ্ণা ফেরার হয়েছে। এই সংবাদ একদিন সকাল-বেলা গোপালনগরের অবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুললে। হাটে, মাঠে, ঘাটে আর চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনার বান ডাকলো। সত্য ও মিথ্যায় মেশানো কত অবিশ্বাস্য কাহিনী প্রচারিত হল।

গুজবের পর গুজবে গ্রাম উঠলো মুখর হয়ে। কিছুদিনের জন্য গ্রাম-বাসীরা কাজকর্ম ছেড়ে ওই কথাই আলোচনা করতে লাগলো। তাদের উদ্বিগ্ন ও শঙ্কাকুল মন বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয়ে যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

কিন্তু সে উৎফুল্লতা স্থায়ী হল না। গৌরীকান্ত আর কৃষ্ণার নিরুদ্দেশ হওয়া তাদের মুখরোচক আলোচনার খোরাক যোগালেও তার প্রতিক্রিয়া দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বঙ্কিমের বাড়ীতে সভা হল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস্-ডি-ও, পুলিশ সুপার থেকে সুরু করে থানার বড়বাবু পর্যন্ত সেই সভায় এলেন। কালাচাঁদকেও আমন্ত্রণ করা হল। গৌরীকান্ত তাঁর পুত্র হলেও তাঁর বিশ্বস্ততা সন্দেহের অতীত।

সভার সিদ্ধান্ত গোপন রাখা হল। কিন্তু পুলিশের আচরণ গ্রামে ত্রাসের সঞ্চার করলে। কৃষক সমিতির উল্লেখযোগ্য কর্মীরা সকলেই গ্রেপ্তার হল। নির্যাতন আর নিপীড়নের ঝড় বয়ে গেল গ্রামের ওপর দিয়ে।

আতঙ্কে গোপালনগর হয়ে গেল মূক।

এই সময় একদিন রাত্রিতে বঙ্কিমের গোলা আর গুদাম আগুন লেগে পুড়ে গেল।

আবার গ্রামের ওপর ছুটে এল পুলিশী সন্ত্রাসের তীব্র তরঙ্গ।

মুখোমুখি বসে গ্রামবাসীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। মূক বেদনার বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠলো।

শশীতারার নির্বিকার মনে হঠাৎ বাজলো ব্যথা। গ্রামবাসীদের বিপদে নয়, বঙ্কিমের ক্ষতিতে সে উদাসীন হয়ে থাকতে পারলে না। গ্রামের লোকের ওপর তার রাগও হল। একবারও সে ভেবে দেখলে না যে এ কাজের জন্য তারা সত্যই দায়ী কি না।

তারা প্রতিশোধ পুলিশের ওপর নিলেই পারত? বঙ্কিম এমন কি করলে যেজন্য তারা তার এতবড় ক্ষতি করতে প্রলুব্ধ হল? সে ভাবতে লাগলো।

কালাচাঁদ প্রচার করছিলেন কৃষক সমিতির দ্বারাই একাজ হয়েছে। পুলিশও পীড়ন করছিল সমিতির কর্মীদের। শশীতারারও দৃঢ়বিশ্বাস হল একাজ তারাই করেছে।

গ্রামের লোকের ওপর তার যেটুকু সহানুভূতি ছিলো তার সবই গেল লুপ্ত হয়ে। তাদের চাপা উল্লাস তার লক্ষ এড়িয়ে গেল না। বঙ্কিমের ক্ষতিতে তারা আনন্দিত হয়েছে। সে জানে কৃষক সমিতির প্রতি তাদের সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন।

তার অন্তরে জেগে উঠলো এক প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তির অন্তরালে বঙ্কিমের প্রতি তার ক্ষোভ ও অভিমান কোথা অবলুপ্ত হয়ে গেল।

পুড়ে যাওয়া গোলার এক প্রান্তে বসেছিল বঙ্কিম। তার গম্ভীর মুখে ফুটে উঠেছে বিরক্তির রেখা। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন অসহ্য হয়ে উঠেছে বলে

অথবা আকস্মিক ক্ষতির ক্ষত মনের গভীরে দাহের সৃষ্টি করার জন্য যে সে বিরক্ত হয়েছে তা নয়।

এইমাত্র কালাচাঁদ এসেছিলেন। কৃষক সমিতির সভ্যদের ওপর পাইকারী হারে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি তাকে প্ররোচিত করছেন। এই প্ররোচনাই তার বিরক্তির হেতু।

কৃষক সমিতির সভ্যদের প্রতি কালাচাঁদের বিরাগের কথা তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তাদের দ্বারাই যে তার গোলা ও গুদামে আগুন লাগবার কাজ সম্পাদিত হয়েছে সেকথা সে এখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না। তার গোলা ও গুদামে যদি তারা আগুন লাগাতেই পারলে তাহলে কালাচাঁদের ধানের মরাইগুলো লুঠ না করে ফিরে গেল কেন? আগুন লাগানোর চেয়ে তো সে কাজ অনেক সহজ ছিল? আর এমন কথা মনে করবারও কোন হেতু নেই যে তার তুলনায় কালাচাঁদের ওপর তাদের রাগ কম।

তার মনে হচ্ছে তাকে দিয়ে কালাচাঁদ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নিতে চাইছেন।

অবশ্য তার এ ধারণা ভুলও হতে পারে। কিছুদিন হল তার মনের গতি গেছে বদলে। চিত্তের স্বাচ্ছন্দ সে হারিয়ে ফেলেছে। তার ঔদ্ধত্য ও অহমিকা যেন চাপা পড়ে গেছে একটা কঠিন আবরণের নীচে। মনে মনে একটা অর্থহীন ক্ষোভ তাকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করে। সে যেন অলস হয়ে পড়ছে। তার মন ভরে গেছে নির্বিকার ঔদাসীন্যে। নচেৎ তাকে প্ররোচিত করবার জন্য কালাচাঁদের কোন প্রয়োজন হত না। সে নিজেই এই ক্ষতির একশগুণ প্রতিশোধ নিতে পারত।

তবু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর এস-ডি-ও'র আগ্রহাতিশয্যে একটা বিবরণী তাকে দাখিল করতে হয়েছে। এই ব্যাপারে বেশী কিছু করতে তার মন চায়নি। যা করবার তাঁরাই করছেন।

কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসবে কিনা সেকথাও সে ভাবছে। হাতে অনেক টাকা জমেছে। গোলা আর গুদাম পুড়িয়ে যারা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা উত্তেজিত করতে চায় তাদের নিবুদ্ধিতার কথা ভেবে তার হাসি পায়।

গোপালনগরে দাসু মুখুয্যে বর্তমানে ধনী বলে পরিচিত। সে তার জন্যই। কালাচাঁদের ঐশ্বর্যের দম্ভ আজ ম্লান হয়ে গেছে। সত্তর বিঘা ধানজমি অবহেলাভরে দান করে দিয়ে সে এই কথাই প্রমাণ করেছে যে তার তুলনায় তিনি ক্ষুদ্র। কালাচাঁদও সেকথা মর্মে মর্মে বুঝেছেন। কিন্তু 'কিল খেয়ে কিল চুরি করা' ছাড়া তাঁর আর কিছু উপায় নেই।

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে সে এই সব কথা পর্য্যালোচনা করছিল মনে মনে। এমন সময় অকস্মাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ালো শশীতারা।

সচকিত হয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠলো। একমুখ হেসে বললে, আরে, এস, এস! ব্যাপার কি?

—কেন আসতে নেই?—কুণ্ঠিতকণ্ঠে শশীতারা বললে।

বঙ্কিম সত্যই বিস্মিত হয়েছিল। তবু সে বললে, কেন থাকবে না, নিশ্চয় আছে? আসনা তো তাই বলছি!

একটি মনোহর ভঙ্গীতে শশীতারা বসল মেঝের ওপরেই। বঙ্কিম ব্যস্ত হয়ে উঠলো, ও কি? ওখানে কেন? এই চেয়ারখানায় বসো না!

—না, এই বেশ!—শশীতারা বললে, চেয়ারের চেয়ে মেঝেই ভালো। —তার চোখে জ্বলে উঠলো কটাক্ষের বিদ্যুৎ।

সে বিদ্যুৎ বঙ্কিমের চোখ ধাঁধিয়ে দিলে।

সে এসেছে মোহিনীর বেশে। পরনের ধূপছায়া রঙের শাড়ীখানি তার সৌন্দর্যকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ। পানের রসে রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দুখানি ধীরে ধীরে কাঁপছে বলে মনে হয়। সুকোমল আর সুগঠিত তনু ঘিরে প্রস্ফুট যৌবন রচনা করছে একটি স্বপ্নময় পরিবেশ।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে বঙ্কিম তার দিকে চাইলে।

আবার কটাক্ষ করে শশীতারা বললে, এ ক'দিন যাওনি কেন?

একথার উত্তর দেওয়ার জন্য বঙ্কিম প্রস্তুত ছিলো না। হঠাৎ তার মনে হল, না গিয়ে সে অন্যায় করেছে। হয়তো শশীতারা এই দিনগুলি কাটিয়েছে তারই প্রতীক্ষায়। তাকেই প্রত্যাশা করেছে তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি।

একটু সময় নিয়ে সে বললে, সময় পাইনি।

—সময় পাওনি?—শশীতারার কণ্ঠ অভিমানে ভারী হয়ে উঠলো।

বঙ্কিম মৃদু হাসলে। বললে, রাগ করো না। সত্যিই সময় পাইনি।

মিথ্যাকথা বলতে তার গলায় বাধলো। তবু তাকে মিথ্যাই বলতে হল। শশীতারার কাছে আর কোনদিন সে মিথ্যা বলেনি।

একটু থেমে সে আবার বললে, তার ওপর এই বিপদ।

—হ্যাঁ। বিপদের কথা শুনেই আমি এলুম।—শশীতারা বললে।

বঙ্কিম চুপ করে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে শশীতারা বললে, তোমার ওপর ওদের এত রাগ কেন? ওই কৃষক সমিতির লোকগুলোর?

—কি জানি।—ইতস্তত করে বঙ্কিম বললে, বোধহয় ওরা ভাবে, যে অত্যাচার ওদের ওপর চলছে তার জন্য আমিই দায়ী।

—তাই যদি হয়, তাহলে কালোবামুনকে ওরা ছেড়ে দিলে কেন?

—যারা ছেড়েছে, সে কথা তারাই বলতে পারে।—উদাস কণ্ঠে বঙ্কিম বললে।

শশীতারা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, ওদের শাস্তি দেওয়ার কি ব্যবস্থা তুমি করছ?

—বিশেষ কিছু করিনি।—বঙ্কিম বললে।

ক্রুদ্ধ শশীতারাকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছিল। বঙ্কিম তার দিকেই চেয়ে রইল।

শশীতারা আবার বললে, তুমি ওদের ছেড়ে দেবে?

তার মুখ লাল হয়ে উঠলো।

—ওদের ওপর খুব বেশী রাগ আমার হচ্ছে না।

এবার হেসে উঠলো বঙ্কিম।

—সে কি?—বিস্ময়ে শশীতারার ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

সেই ভ্রূভঙ্গিমার দিকে চেয়ে বঙ্কিম কি ভাবছিল। পিছনের বাগা থেকে অশ্রান্তভাবে একটা পাখী ডাকছিল। বোধহয় ঘুঘু। দুজনের স্তব্ধতার মাঝখানে সেই শ্রান্তিহীন ধ্বনি একটা বিসদৃশ আবহাওয়ার সৃষ্টি করলে।

হঠাৎ এক সময় বঙ্কিম বললে, আমার সঙ্গে চলে যাবে তারা?

—কোথা?—শশীতারার বিস্ময়চকিত চোখের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল বঙ্কিমের ওপর।

—যেদিকে দুচোখ যায়? দিল্লী, আগ্রা, লাহোর কিংবা আরো অনেক দূরে?—বঙ্কিমের কণ্ঠ আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠলো।

—ছিঃ! লোকে কি বলবে।

—অপবাদ দেবে!

বঙ্কিম হাসলে,কেন দেবে না? অপবাদেরই কাজ যে! কিন্তু তুমি কি শুধু লোকাপবাদের ভয়ই করছ না আর কোন আপত্তি আছে?

শশীতারা কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠলো। সে বললে, তা কি হয়?

—স্পষ্ট করে বলো কেন হয় না?

বঙ্কিমের কণ্ঠস্বরে শশীতারা চমকে উঠলো। তার দিকে চেয়ে তার ভয় ভয় করতে লাগলো। উত্তেজনায় তার মুখ উঠেছে আরক্ত হয়ে। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক। পুরুষের এই চেহারা মেয়েদের কাছে আতঙ্কের।

বঙ্কিম আবার বললে, তোমায় স্পষ্ট করে বলতে হবে কেন তা হয় না।

নিরুত্তর শশীতারা বসে রইল পাথরের প্রতিমূর্তির মতো। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

—আমি জানি কেন তা হয় না।—হা হা করে হেসে উঠলো বঙ্কিম। তার কণ্ঠস্বরও কেমন যেন বীভৎস শোনাতে লাগলো, হৃষিকেশের বউ তুমি, আমার সঙ্গে কি করে যাবে? তাই না? ভালো, এই একনিষ্ঠা আমিও পছন্দ করি। আমার সঙ্গে গেলে হৃষিকেশের গান অমন আপন-ভোলা হয়ে গাওয়া চলবে না। সেকথা তুমিও জান। একুল আর ওকূল এই দুকূল বজায় রাখতে তুমি পারবে না। কিন্তু একটা কথা আজ জিজ্ঞাসা করি। আমায় নিয়ে এই খেলা কেন সুরু করেছিলে? এক-জনকে ভুলতে যখন পারবে না, তখন আর একজনকে প্রলুব্ধ করলে কেন?

শশীতারা অবাক হয়ে গেল। বঙ্কিম এসব কি কথা বলছে? হৃষিকেশের গান সে গাইবে না তো গাইবে কে? তা ছাড়া বঙ্কিমকে নিয়েই বা কি খেলা সে করেছে? কই, তাকে প্রলুব্ধ করতে তো সে চায়নি? সে নিজেই এসে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল। তার মুখ ছাইএর মতো সাদা হয়ে গেল। সে বললে, কি বলছ তুমি? যত সব বাজে কথা। আমি উঠি, তোমার আজ মাথার ঠিক নেই।

কড়া কথা বলতে তার সাহস হল না। ভয়ে বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছিল আর লজ্জায় ও ঘৃণায় তার অন্তরাত্মা উঠছিল শিউরে। কে জানত বঙ্কিমের মনে এতখানি নোংরামি প্রচ্ছন্ন হয়েছিল?

সে উঠে দাঁড়ালো।

তাকে দাঁড়াতে দেখে বঙ্কিম হেসে উঠলো উন্মাদের মতো। বললে, পালিয়ে যাচ্ছ? ভয় নেই। হৃষিকেশ আমার বাল্যবন্ধু ছিলো। তার

বউকে আমি অপমান করব না। হিতাহিত বুদ্ধিবিবেচনা আমার লোপ পায়নি। কিন্তু আমি পারতুম তারা, তোমার সমস্ত দর্প আর অহঙ্কার আজ চূর্ণ করে দিতে পারতুম। আমার কামনা তোমার সৌন্দর্যকে বিষাক্ত করে দিত। ধর্ম, নীতি বা সংস্কার কোন কিছু আমায় বাধা দিতে পারত না। তবু তুমি বেঁচে গেলে। কেন তা জান? তোমার আর আমার মাঝখানে একটা 'মমী' আছে! সেই 'মমী'টা....

সে তার কথা শেষ করতে পারলে না। তার চোখ জ্বলে উঠলো।

ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে শশীতারা তার দিকে রইল চেয়ে। একটা দানবের সামনে সে যেন অকস্মাৎ হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

তার চোখে চোখ রেখে ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টিতে বঙ্কিম বললে, 'মমী' কাকে বলে জান? না, জাননা! থাক, জেনে লাভ নেই। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে আমার চেয়ে সেই 'মমী'টা হল ভাগ্যবান।

তার মুখখানা কালো হয়ে উঠলো।

শশীতারার সারা দেহ কাঁপছিল থরথর করে। প্রাণপণ শক্তিতে মনে সাহস এনে সে রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, আমি এবার যাই?

বঙ্কিম আবার হাসলে। হিংস্র আর কুটিল হাসি। বললে, যাও! তবে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গেলে সে কথা কোনদিন ভুলো না যেন!

সঙ্কুচিত শশীতারা বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে অন্তরে গ্লানি নিয়ে। বঙ্কিমের কথাগুলো তীক্ষ্ণ সূচীমুখের মতো তার গায়ে বিঁধছিল। সে ছটফট করতে লাগলো জ্বালায়। তার এই দুঃখই মর্মান্তিক হয়ে উঠলো যে বঙ্কিমকে একটাও কড়া কথা সে বলতে পারলে না। বলবার সাহসও তার হল না। অথচ সে তার প্রত্যেকটি কথার কঠিন উত্তরই দিতে পারত।

বঙ্কিম স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দুহাতে মুখ ঢেকে।

বাইরে রৌদ্রের তেজে পৃথিবী যেন পুড়ে যাচ্ছিল।

দশ

গ্রীষ্মের আতপ্ত পৃথিবী স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো জলধারায়। বর্ষা নামলো। গোপালনগরের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ উঠলো সজীব হয়ে। নববরষার ঘনশ্যাম মেঘে মেদুর আকাশ সৃষ্টির বুকে জাগিয়ে তুললে ঘনঘটার সমারোহ।

গ্রীষ্মের জ্বলে-যাওয়া মাঠে বর্ষার স্পর্শ-প্রখর রোমাঞ্চ। খরধারায় ভরে উঠলো খাল, বিল আর দীঘিগুলো। সৈনিকদের শিবিরশ্রেণী থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হল। কণ্ট্রাক্টররা বেশী মজুরী দিয়ে মজুর নিয়ে এল ট্রাক বোঝাই করে। গোপালনগর থেকেও অনেকে মজুরীর লোভে কাজ করতে গেল।

সৈনিকরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। অসহ্য গরমে, শুধু গায়ে মাত্র হাফপ্যাণ্টপরা অবস্থায় বাগানে বাগানে ঘুরে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফুটবল খেলে আর নৃত্য করে তারা আরাম পাচ্ছিল না। তারা যেন নব-জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে লাগলো।

নতুন উদ্যম নিয়ে তারা মাখমের টিনে পাঁউরুটী ডোবালে। মাংস যত খেলে তার বেশী দিলে ফেলে। প্রত্যেক তাঁবুর পাশে প্রত্যহ অপচিত খাদ্যবস্তুর স্তূপ জমে উঠতে লাগলো।

সেই স্তূপগুলিকে কেন্দ্র করে মানুষে আর কুকুরে সুরু হল কাড়াকাড়ি।

নববর্ষা গোপালনগরের মানুষগুলিকে আরো অসন্তুষ্টই করে তুললে। শস্যহীন মাঠে সজীব আর সতেজ দুর্বাদলগুলি যেন তাদের বিদ্রূপ করতে লাগলো।

উদাসদৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকত মাঠের দিকে। যে মাঠে তারা প্রতি বর্ষায় কাজ করেছে। অতিবৃষ্টি হলে দেবতাকে জানিয়েছে মিনতি

আর অনাবৃষ্টিতে করেছে অভিসম্পাৎ। তাদের কেউ কেউ সেই মাঠেতেই মাটি ফেলে তাঁবুর মেঝে উঁচু করার কাজে লেগেছে। কিন্তু সে কাজে তাদের কোন সান্ত্বনা নেই। অকর্ষিত মৃত্তিকা তাদের অন্তরের ধূমায়মান অসন্তোষকে করে তুলছে উগ্রতর :

কালাচাঁদ পর্যন্ত বিমর্ষ হয়ে উঠলেন মাঠের দিকে চেয়ে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি সঙ্কটাপন্ন। লুব্ধ শার্দুলের মতো ব্রহ্মসীমান্তে জাপান থাবা পাকিয়ে বসে আছে। মিশরের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য অতিক্রম করে জার্মান সেনাদলও নাকি ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সাঁড়াশী আক্রমণের দুই বাহু হয়ে আছে উদ্যত। ভারতবর্ষ অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। আমেরিকান রণসম্ভার সেখান থেকে চীনে সরবরাহ করা হচ্ছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আপোষ হওয়ার শেষ সূত্রটাও ছিন্ন হয়ে গেছে। ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স বিলাতে বসে আপোষ না হওয়ার সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়েছেন কংগেসের ওপরে। রাষ্ট্রপতি আজাদ অভিযোগ এনেছেন ক্রিপ্‌সের নামে। আপোষের সম্ভাবনা যখন রূপ নিচ্ছিল তখন কোন রহস্যময় কারণে তিনি নিয়েছেন হাত গুটিয়ে।

সমুদ্রের দুই পার থেকে শোনা যাচ্ছে পরস্পরবিরোধী অভিযোগ।

গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি হরিজনে প্রকাশিত হচ্ছে। অত্যাচার-কারীদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তিনি অসহায়া নারীদের নখ আর দাঁতের সাহায্য নিতে উপদেশ দিয়েছেন।

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছে বিদ্যুৎগতিতে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে গোপালনগরের মানুষগুলি হতাশার সম্মুখীন হচ্ছে। কর্মহীন কৃষকদের চোখের সামনে ঘনিয়ে উঠছে নিবিড় অন্ধকার। ভারাক্রান্ত চিত্তে তারা প্রস্তুত হচ্ছে চরম দুঃসাহসের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য।

বঙ্কিমের গোলা থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে শশীতারা ফিরে যাচ্ছিল বাড়ীর দিকে। পথে দেখা হয়ে গেল গোবর্ধনের সঙ্গে।

শশীতারার ত্রস্ত পদক্ষেপ আর বিবর্ণ মুখ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। উদ্বিগ্নমুখে সে বললে, কি হয়েছে রে ?

শশীতারার ওপর সে প্রসন্ন ছিলো না। কিন্তু তার মুখ এমনই অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল যা লক্ষ করে গোবর্ধন উদ্বেগ বোধ না করে পারলে না। সে শুধু তাঁর গাঁয়ের মেযে নয়, প্রতিবেশীর মেয়ে। কৃত্তিবাস তাকে বড়ভাই বলে ডাকে। কৃত্তিবাসের সঙ্গে তার সম্প্রীতিও ছিলো যথেষ্ট। অবশ্য সেই সম্পীতি বর্তমানে বজায় নেই। কৃষক সমিতির যাবতীয় গোপন সংবাদ সে আর শশীতারা বঙ্কিমকে সরবরাহ করে এই সংবাদ জানতে পারার পর থেকেই গোবর্ধন তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। তার বিরুদ্ধতা কৃত্তিবাসের ক্ষতিও করেছিল যথেষ্ট। তাদের সমাজে তাকে একরকম একঘরে হয়েই বাস করতে হত।

আজ কিন্তু গোবর্ধন তার বিরুদ্ধভাব বজায় রাখতে পারলে না।

দুর্জয় ক্রোধে আর অপমানে শশীতারার বুকের ভিতর জ্বলে যাচ্ছিল। তার হিতাহিত বুদ্ধি, বিবেচনা সব গিছল লুপ্ত হয়ে। বঙ্কিমের কলুষিত কামনার পরিচয় পেয়ে সে যেমন স্তম্ভিত হয়ে গিছল তেমনি বঙ্কিম তার মৃত স্বামীকে ঈর্ষা করে একথা জানতে পেরে তীব্র ঘৃনায় সে উঠছিল শিউরে।

হয়তো বঙ্কিমকে সে ভালোবেসেছিল। কিন্তু তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন নীচতা তাকে এনে ফেললে গ্লানির একটা জঘন্য আবর্তের মধ্যে। সে আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো গোবর্ধনের দিকে চেয়ে।

বিহ্বল গোবর্ধন আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন?

শশীতারা কাঁদতে লাগলো উচ্ছ্বসিত হয়ে। অশ্রু হয়ে তার অন্তরের নিরুদ্ধ ব্যথা বেরিয়ে আসতে লাগলো বাইরে।

গোবর্ধন অনুমান করলে গুরুতর কিছু ঘটেছে। পথে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে সে তাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ীতে।

ব্যক্তিগত ভাবে কালাচাঁদের ওপরেই গোবর্ধনের রাগ ছিলো বেশী। কালাচাঁদও তাকে মনে মনে ভয় করতেন। সেইজন্য কৃষক সমিতির বহু বিশিষ্ট সভ্যের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন হলেও গোবর্ধনকে এ পর্যন্ত বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। সামান্য বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখতে কালাচাঁদ চাননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে এমন শাস্তি তাকে তিনি দেবেন যাতে তার মেরুদণ্ড যায় ভেঙে। ঋজু দেহ নিয়ে সে যেন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

শশীতারার কাহিনী শুনে গোবর্ধন কিন্তু বঙ্কিমের ওপরেও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তবু সঙ্কোচবশত শশীতারা সব কথা বলতে পারেনি। তার রাগ এমনি প্রচণ্ড হয়ে উঠলো যে কিছু সময়ের জন্য কালাচাঁদের কথাও সে গেল ভুলে। কালাচাঁদ সুবিধা পেলেই তাকে জব্দ করবেন সেকথা সে জানত এবং সেজন্য তার সতর্কতার অবধি ছিলো না। কিন্তু রাগে সে এমনি আত্মহারা হয়ে উঠলো যে সেই সতর্কতার কথাও তার স্মরণ রইল না।

কৃষক সমিতির সকলকে ডেকে সে শোনালে শশীতারার কাহিনী।

নারীর প্রতি অত্যাচার চিরদিনই মানুষকে উত্তেজিত করে।

কৃষকেরা ভুলে গেল বঙ্কিমের সঙ্গে শশীতারার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে তারা কত আলোচনা করেছে। কৃত্তিবাসকেও কত কথা বলেছে। শশীতারার সম্বন্ধেও এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করেছে যা শুধু রুচিবিগর্হিত নয় সর্বোতো-ভাবে নিন্দনীয়।

কিন্তু তারা ভুলে গেল সেই সব কথা

কৃত্তিবাস আর শশীতারার বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ রইল না। কৃত্তিবাস যে তাদেরই মতো অসহায়, দুপয়সা উপার্জনের জন্য বঙ্কিমের তোষামোদ করত সেই সত্য তাদের কাছে বড় হয়ে উঠলো। শশীতারাকেও তারা ক্ষমা করলে, ক্ষমা করার পিছনে কোন যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও। উৎপীড়িতা নারী সকলের কাছেই দাবী করে সহানুভূতি।

তাদের অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো বঙ্কিমের বিরুদ্ধে।

গোবর্ধন পঞ্চায়েত বসালে। কৃষক সমিতির সকলেই তাতে যোগদান করলে। সমিতির বাইরের লোকেরাও এল। সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নারীর লাঞ্ছনা ও অপমান কেউ বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

কৃত্তিবাত নিজেও বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

সে বঙ্কিমের সংস্রব ত্যাগ করে এল। সেদিনও যে চাকরীর ভয় তাকে উতলা করে তুলত সেই চাকরী সে ছাড়লে ঘৃণাভরে। শশীতারা তার বড় আদরের মেয়ে। তার অপমানে তার ধমনীর রক্ত উঠলো উত্তপ্ত হয়ে। আর তার মন ভরে উঠলো নিদারুণ আত্মগ্লানিতে। সে জানত বঙ্কিমের এতখানি দুঃসাহসী হয়ে ওঠবার মূলে তার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিলো। সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারলে না। হাতযোড় করে গোবর্ধনকে বললে, মাফ করো বড় ভাই! অনেক কুকাজ করিচি! যদি চাও তো আমার মুয়ে গোটাদুই নাথি মারো!

—নাথি মারব কেন? যদি তোর বুদ্ধি বিবেচনা হয়ে থাকে তো ভাল। তোরই সর্বনাশের পথ বন্ধ হবে।—গোবর্ধন বললে।

চোখের জলে কৃত্তিবাসের বুক ভেসে গেল। সে বললে, সত্যিই আমি আমার সব্বোনাশ করতে বসেছিলুম। হায়! হায়! হায়!—সে বুক চাপড়াতে লাগলো।

গোবর্ধন তাকে সান্ত্বনা দিলে, থাক, আর আফশোষ করিসনি

যা হবার তা হয়েছে। 'দশ লাগে তো ভূত ভাগে!' এবার সকলের সঙ্গে একমত হয়ে চল।

—তাই চলব বড় ভাই, তাই চলব! তোমরা আমায় বাঁচাও! আমার সাধ যাচ্ছে ফেঁড়ে দু'খানা করে ফেলি ওই শালা বঙ্কিমকে।

—ওসব কথা এখন থাক!—গোবর্ধন গম্ভীর হয়ে উঠলো।

পঞ্চায়েতের কাছে কৃত্তিবাস আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলে।

সকলের ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিবদ্ধ হল বামুনপাড়ার দিকে। তাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এই ঘটনা তাদের এনে দাঁড় করালে একশ্রেণীতে। তাদের সম্প্রদায়ের একটি নারী উৎপীড়িত হয়েছে সেজন্য তারা নিজেদেরও বোধ করতে লাগলো অপমানিত।

কালাচাঁদ লক্ষ করলেন দাসপাড়ার সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাদের মুখপাত্র হয়েছে গোবর্ধন। তাঁর কুটিল দৃষ্টি নিবদ্ধ হল গোবর্ধনের প্রতি। সে দৃষ্টি শনির দৃষ্টির মতোই ভয়ঙ্কর।

তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। গৌরীকান্তের আচরণ তাঁকে উন্মত্ত করে তুলেছিল। সমগ্র কৃষক সমিতিকে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার সঙ্কল্প তিনি করলেন। ছোট, বড় কাকেও বাদ না দিয়ে।

দাসপাড়ার প্রতিবাদের ভাষা কঠোর।

কূটবুদ্ধিতে কালাচাঁদও কম যান না। মাহিষ্যদের বিরুদ্ধে বামুনপাড়ায় অপপ্রচার করতে সুরু করলেন তিনি। তাঁর প্রভাব এবং প্রতিপত্তি সমস্তই নিয়োজিত হল এই উদ্দেশ্যে।

বিদ্বেষের কালো মেঘে আকাশ হয়ে উঠলো কুটিল। সন্দেহ আর অবিশ্বাস বাসা বাঁধলো সকলের মনে।

দাসপাড়ার পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত জানা গেল না। কিন্তু দুপক্ষ থেকেই অপপ্রচার চলতে লাগলো। একপক্ষ উৎকণ্ঠিত আর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো ছোটলোকদের স্পর্ধা হয়েছে বলে। অপরপক্ষে, তথাকথিত ছোটলোকেরা

আর ছোট হয়ে থাকতে চাইলে না। তাদের দাবী হয়ে উঠতে লাগলো দুর্দমনীয়।

যাদের মধ্যে বর্ণগত ভেদ থাকা সত্বেও সুখদুঃখের সমঅংশিদারীত্ব গ্রহণে কোন আপত্তি কখনো ওঠেনি, শ্রেণী হিসাবে পৃথক হলেও মানুষ হিসাবে যারা ছিলো একত্র হয়ে, পুরুষানুক্রমে যাদের প্রীতির বন্ধন ছিলো অটুট, তাদের মধ্যে বিভেদের পাকা প্রাচীর উঠলো। ব্যবধান দুটি সম্প্রদায়কে দুই বিপরীত দিকে ঠেলে নিয়ে চলল বিপুল বলে।

কালাচাঁদের প্রচার-কৌশলে বামুনপাড়ায় অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কয়েক পুরুষে যা সম্ভব হয়নি কয়েক দিনে তিনি তাই সম্ভব করে তুললেন। গোপালনগরের ইতিহাসে এখানকার বামুনেরা আর কখনো এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়নি। যে দশঘরের কলহ ও কুচক্র চিরন্তন বলে মনে হত, যাদের প্রত্যেকেই ছিলো একঘরে হয়ে তারা অকস্মাৎ এক হয়ে গেল। পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান, খাওয়াদাওয়া সবই চলতে লাগলো। কালাচাঁদ তাদের সংগঠিত করে তুললেন শ্রেণীহিসাবে, শুধু শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার করে।

সেই শ্রেণীবিদ্বেষ মাহিষ্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হল। শুধু কালাচাঁদ আর বঙ্কিমের প্রতি নয় গোটা বামুনপাড়ার ওপরেই তারা উঠলো ক্রুদ্ধ হয়ে। তাদের ক্রোধ ও বিদ্বেষের বহ্নিতে ইন্ধন যোগাতে লাগলো সঙ্কীর্ণতা ও অশিক্ষা।

গোপালনগরের মানুষেরা বিবদমান দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। একদিকে সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে দরিদ্র কৃষক, সংখ্যায় অনেক বেশী।

এগারো

গৌরীকান্ত দাড়ি রেখেছে। কালো কাচের চশমা পরে সে পথ চলে বিচিত্র ভঙ্গীতে। সতর্ক দৃষ্টি আর সন্ত্রস্ত মন নিয়ে সে ঢোকে কলকাতার এক গলি থেকে আর এক গলিতে। কি একটা অস্বস্তিবোধে ছেয়ে যায় মন। মনে হয় অনেকগুলি তীক্ষ্ণ ও শ্যেন দৃষ্টি উদ্যত হয়ে আছে তার দিকে।

আশ্রয় একটা তার আছে। কিন্তু সেখানেও সে নিশ্চিন্ত নয়। ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করে থেকেও তার পরিত্রাণ নেই। রাত্রির ঘুমেও নেই আরাম। এলোমেলো দুঃস্বপ্ন আর অর্থহীন দুশ্চিন্তা মুহূর্তগুলিকে করে তোলে বিব্রত। কার বিরক্তিকর অস্তিত্ব দৃষ্টির অন্তরাল থেকে যেন মেলে আছে রক্তচক্ষু! কল্পনায় কখনো কখনো একখানি অদৃশ্য হাত তাকে সচকিত করে তোলে। সেই হাতে দোদুল্যমান একটা হাতকড়ি। হাতখানা যেন ধীরে ধীরে তারই দিকে আসে এগিয়ে।

সতর্কতা কাকে বলে এইবার সেকথা যেন সে শিখলে। এই জীবন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সতর্কতায় অভ্যস্ত হওয়াই হয়েছে তার মুলমন্ত্র। এ অভ্যাসের সঙ্গে আর কোন কিছুর তুলনা হয়না। ক্লান্তিকর নিরানন্দ ও কঠিন একটা ব্যাধির মতো সতর্কতা তাকে জড়িয়ে ধরেছে, সাপের মতো পাকে পাকে।

সে ফেরারী আসামী। তার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে যে তাকে ধরিয়ে দিতে পারবে সে পাবে পুরস্কার। তার ফটোও থানায় থানায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই জীবনের মধ্যে যেটুকু রোমাঞ্চ আছে তাও সে অনুভব করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কলকাতা সহর।

সেখানে এসে ভীড় করেছে বর্মার আশ্রয়প্রার্থী, বিদেশী সৈন্য আর নানা দেশের স্বার্থান্বেষী মানুষ। সেখানে ধীরে ধীরে প্রত্যহ বাড়ছে নিরন্নের ভীড়। মিলিটারী ভ্যানের বিদ্যুৎগতিতে সেখানে মানুষের মর্মস্থল অবধি উঠছে কেঁপে। ট্রামে, বাসে, রিক্সায় সেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভীড়ে শ্বাস হয়ে আসছে রুদ্ধ। মাঝে মাঝে 'সাইরেনে'র গোঙানিতে সেথা মৃত্যুর হিমশীতল অনুভূতি উঠছে জেগে অসহায় আর্ত জীবনকে বিচলিত করে। সেখানে এবং সেই সময় সর্বশক্তিমান গভর্ণমেণ্টের সন্ধানী চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে, স্বচ্ছন্দে না হলেও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার রোমাঞ্চ সে অনুভব করে বৈকি! এই অজস্র মানুষের ভীড়ে আত্মগোপন করে থাকার একটা আনন্দ তাকে মাঝে মাঝে উদ্বেল করে তোলে। কঠিনতম কর্তব্যের সম্মুখীন সে হয়েছে আর সেজন্য কোন মূল্য দিতেই দ্বিধাবোধ করেনি সেকথা ভেবেও সে হয় উল্লসিত।

তাকে বিচলিত করে কৃষ্ণার চিন্তা। রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে বর্ষণের শেষে মাটির গর্ভ থেকে যেমন একটা উত্তাপ বাইরে বেরিয়ে আসে তেমনি একটা দাহময় অনুভূতি তার জীবনের দিগ্বিদিকে সহসা জাগিয়ে তোলে বিপর্যয়।

শ্যামল আর উর্বর পৃথিবীর সমস্ত শোভা ও সম্পদ কে যেন হরণ করে নেয় তার চোখের সামনে থেকে। ধূসর ও রুক্ষ মৃত্তিকাস্তূপে আকীর্ণ জরাজীর্ণ বসুন্ধরা অস্থিসার কঙ্কালের মতো ফুটে ওঠে বিকৃত ও বীভৎস রূপ নিয়ে। তার অক্ষিকোটর ঠেলে বেরিয়ে আসে ভাষাহীন এক তীক্ষ্ণ তিরস্কার।

কৃষ্ণা গ্রামে আত্মগোপন করে আছে। সম্পূর্ণ একা আর অসহায়। তাকে সাহায্য করবার জন্য যারা আছে তারা নির্বোধ।

গৌরীকান্ত যদি তাকে কলকাতায় নিয়ে আসত। তার একাকীত্ব তাহলে হয়তো এতখানি অসহনীয় হয়ে উঠত না। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের

মধ্য দিয়ে পথচলার মতো উদ্বেগপূর্ণ পদক্ষেপগুলি হয়ে উঠত আকর্ষনীয়। নিরুদ্দেশের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় বুক ভরে উঠত আশা ও আনন্দে।

অন্ধকারে তারা তুজনে উঠত দীপ্ত হয়ে নক্ষত্রের মতো।

কিন্তু তা হয় না। বিকাশের নির্দেশ অন্যরূপ।

গৌরীকান্তের জীবনে সান্ত্বনাও আছে। সে সান্ত্বনা, কবি। তার মতোই আদর্শবাদী একটি তরুণ।

তার নাম পৃথিবীনাথ। কিন্তু কবি বলেই সে পরিচিত। শীর্ণ ও দীর্ঘ দেহ। হাড়গুলো শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা। চোখেব দৃষ্টি অন্তর্ভেদী।

সেও আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু গৌবীকান্তেব চেযে সে স্বচ্ছন্দ ও শান্ত। জীবনের তুঃখতুর্দ্দশা নিযে সে অসঙ্কোচে পরিহাস করে। ভাগ্যবিড়ম্বিতদের প্রতি নিষ্ঠুর হযে ওঠে বিদ্রূপে। দারিদ্রের প্রতি প্রকাশ কবে অপরিসীম ঘৃণা।

যদিও সে নিজেই তুঃখী, ভাগ্যবিডম্বিত ও দরিদ্র।

সময় সময় গৌরীকান্তের তাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয। সৃষ্টিকে আর জীবনকে ব্যঙ্গ করাই যেন তার অভ্যাস। প্রচলিত প্রত্যেকটি সংস্কারকে কটাক্ষ করাই বুঝি তার অভিপ্রায।

কিন্তু বড মধুর তার স্বভাব। সেই স্বভাবের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই।

মির্জাপুরের মেসবাড়ীতে কবিকে নিয়ে দিন কাটানোর মধ্যে গৌরীকান্ত খুঁজে পায় সান্ত্বনা। বাস্তব জীবনের বিডম্বনা আর তৃষ্ণার অভাববোধ বেদনার মর্মরে যখন মর্মরিত হয়ে ওঠে তখন কবি সৃষ্টি করে একটি প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশের। সহানুভূতিতে আর্দ্র আর সমবেদনায় নিবিড় সেই পরিবেশ।

শ্রমিকদের মধ্যে সে কাজ করছে। মিল আর ফ্যাক্টরীর কুলি কোয়ার্টারগুলোতেই কাটে দিনের অধিকাংশ সময়। দিন-মজুরী করে যারা খায় তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে সে হয়ে পড়েছে জড়িত। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যথার রঙে রাঙিয়ে সে হয়ে উঠেছে দরদী। তার সেই দরদ প্রাণময় আর জীবন্ত।

শ্রমিকেরা তাকে বিশ্বাস করে।

গোপালনগরের আর কৃষ্ণার সংবাদও আসে। এক্ষেত্রেও কবিই হয়েছে যোগাযোগরক্ষাকারী। গোপালনগরের ও তার আশেপাশের গ্রামগুলির কৃষকদের ওপর চলছে অকথ্য অত্যাচার সেই সংবাদ সে পায়। তারা দিন দিন বেপরোয়া হযে উঠছে আর তাদের অভাব হয়ে উঠছে তীব্র সেকথাও সে জানতে পারে। যে কোন মুহূর্তে সেথা সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেতে পারে।

শুধু সেখানকার নয়, সারা ভারতবর্ষের এই অবস্থা। গৌরীকান্ত জানে বিস্ফোরণ আসন্ন।

দেশের বৈপ্লবিক শক্তি অসীম ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করে আছে সেই বিস্ফোরণের। প্রত্যাশিত সেই মুহূর্তটির আগমন সম্ভাবনায় স্পন্দিত হচ্ছে অসংখ্য হৃদয়। অনিবার্যের আবির্ভাবের আশায় তারা প্রহর গুণছে।

সেই মুহূর্ত কবে আসবে? রুদ্রের আত্মপ্রকাশ মেঘের মতো অকস্মাৎ ছেয়ে ফেলবে চতুর্দিক। পাগলা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঝড় আসবে ছুটে!

ব্যাকুল আগ্রহে গৌরীকান্ত প্রশ্ন করে নিজের মনকে।

কবি একদিন বলছিল ঃ

"O what is that sound which so thrills the ear
  Down in the valley drumming, drumming?
Only the scarlet soldiers, dear,
  The soldiers coming."

গৌরীকান্তের চোখ জ্বলে উঠলো। সে বলে উঠল, কবে কবি, কবে সেদিন আসবে? কবি আবার বললে:

"O it's broken the lock and splintered the door,
O its the gate where they're turning, turning;
Their feet are heavy on the floor
And their eyes are burning"

সে চেয়ে রইল কবির স্বচ্ছ চোখের দিকে।

হঠাৎ সেই দৃষ্টি বাঁকা হয়ে উঠলো বিদ্রূপে। গৌরীকান্তকে সে বললে, অধৈর্য হচ্ছ কেন বিপ্লবী? সেদিন আসবে। "লিকি বোট" এ করে আমরা সেইদিনকে আনতে চেয়েছিলুম কিন্তু আমাদের নেতারা তাকে আনছেন "সেফটি বোট"এ বুঝলে? দিনটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকো।

—প্রস্তুত হযেই তো আছি। —গৌরীকান্ত উত্তর দিলে।

কবি আপন মনে হাসলে। বললে, বিপ্লব আসছে "সেফটি বোট" এ। উনিশ শ আটত্রিশ থেকে উনিশ শ বিয়াল্লিশ। বড ধীর আর মন্থর গতি নেতারা তবু, বিপ্লবীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। 'ত্রিপুরী'র কলঙ্ককাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে অভিনন্দিত করছে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে!

—আজ একথা আলোচনা করে লাভ কি? —গৌরীকান্ত বললে।

—লাভ আছে বৈকি! —কবি উত্তেজিত হয়ে উঠলো, মনে আছে গান্ধীজীর বিদ্রূপ 'সুভাষবাবু তো আর দেশের শত্রু নন? মনে আছে অমৃতবাজার পত্রিকার লীডার "লষ্ট লীডার"? পরাজয়ের মর্মবেদনায় রাজকোটের রাজনৈতিক অনশনের কথা এত শীগগীর ভুলে গেলে? অহিংসার ট্রেডমার্ক ললাটে এ কে যে বিপ্লবকে এবার আমদানী করা হবে তাকে বিচার করতে গেলে ওই কথাগুলি মনে না রাখলে চলবে না। সেদিন যে

সব দক্ষিনপন্থি নেতারা অহিংসার নামে বিগলিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের যাচাই করবার কষ্টিপাথর হবে ওই কথাগুলো। গণ-আন্দোলনকে আর ঠেকিয়ে রাখা চলবে না এসত্য তাঁরা জানতে পেরেছেন তাই নেতাগিরি বজায় রাখবার জন্য চলেছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। অথচ এরাই সেদিন আসরে নেমেছিলেন অহিংসার মাহাত্ম্য প্রচার করতে। এই দল বজায় রাখার অহিংসার চেয়ে প্রকাশ্য হিংসা ছিলো বহুগুণে শ্রেয়।

—দল বজায় রাখার অহিংসা? —গৌরীকান্ত হেসে উঠলো।

কবি বললে, হ্যাঁ ঠিক তাই। আমরা সবাই জানি, একা গান্ধীজী ছাড়া আমাদের নেতাদের কেউ অহিংসার আদর্শে আস্থাবান নন। অথচ অহিংসার নামে 'ত্রিপুরী'তে তাঁরা কি হিংসার ভেল্কিই না দেখিয়ে দিলেন। এতগুলি বৈষ্ণবকে দেখে দুনিয়াশুদ্ধ লোকের তাক্ লেগে গেল। অবশ্য তাঁদের রাজনৈতিক গুরু গান্ধীজীর লেগেছিল কিনা জানিনে। কারণ তাঁরা তাঁর সঙ্গেও প্রবঞ্চনা করেছিলেন।

—কি বলছ কবি?

—ঠিক বলছি। অহিংসা কীর্তন করে 'ত্রিপুরী'তে যাঁরা 'পন্থ প্রস্তাব' গ্রহণ করলেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সভাপতির মর্যাদা খর্ব করে গান্ধীজীকে করলেন কংগ্রেসের ডিক্টেটর, তাঁরাই আবার 'ক্রিপস অফার' গ্রহণ করবার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে নিতে চাইলেন দেশ-রক্ষার দায়িত্ব। মিত্র-শক্তির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার কথাও ঘোষণা করলেন বড়গলায়। গান্ধীজীর কংগ্রেস থেকে সরে যাওয়ার মতো ঘটনাও তাঁদের মনে রেখাপাত করতে পারলে না। সাধের অহিংসা দরিয়ায় গেল ভেসে। সকলের মুখোস খসে পড়ল একসঙ্গে। দেশের লোক জানতে পারলে যে অহিংসায় অবিশ্বাসী বলে সুভাষ বোসকে 'ত্রিপুরী'তে লাঞ্ছিত করা হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতা দলবিশেষের হাতে রাখবার জন্য একটা অহিংস ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

গৌরীকান্ত কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কবি তাকে থামিয়ে দিলে, ক্ষমতা রাখবার মোহে তাঁরা এতই মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে একবার ভেবে দেখবারও অবসর পাননি এই বিরাট দেশের কোটী কোটী মানুষের কথা। অহিংসার ভৈরবী-চক্র না থাকলে আজ কিনা হতে পারত? বিপ্লবের পথ পরিহার করে যাঁরা 'ক্রিপস অফার'' গ্রহণ করবার জন্য অনর্থক মস্তক কণ্ডুয়ন করলেন জনসাধারণ তাঁদের কি করে ক্ষমা করবে?

গৌরীকান্ত বললে, সে সমালোচনা আমরা করব না। আমরা সৈনিক। আসন্ন বিপ্লবে আমাদের অংশ-গ্রহণ করতে হবে। আমরা শুধু সেই মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করব।

—কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা যে আমাদের আছে সে কথা অস্বীকার করব কি করে?—কবি বললে, যুদ্ধকে ইচ্ছা করে কেন বিলম্বিত করা হল, উপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে সেনাপতি কেন সৈন্য পরিচালনা করলেন না, অভিযানের মূল্যবান সময়টি বয়ে গেল কেন সে প্রশ্ন করবার অধিকার আমাদের নিশ্চয় আছে।

—অভিযানের সময় কি সত্যই বয়ে গেছে?

—নিশ্চয়। শুধু তাই নয় যে যুদ্ধ করতে আমরা যাচ্ছি সেই যুদ্ধের সৈনিকদের আজো উপযুক্তভাবে সংগঠিত করা হয়নি। কংগ্রেসকে নির্ভেজাল অহিংস প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, কংগ্রেস থেকে দুর্নীতি দূর করার কত উদ্যোগ আয়োজনই না দেখছি। কিন্তু কংগ্রেসকে রাজনৈতিক দলে পরিণত করার প্রয়াস আজো সম্পূর্ণ হল না। জনসাধারণের সংগঠন জনসাধারণকেই দূরে সরিয়ে রাখলে?

কবির এই ধরনের বিলাপের সঙ্গে গৌরীকান্ত পরিচিত। তাকে অন্য প্রসঙ্গে টেনে আনলে গৌরীকান্ত। বললে, অতীত নিয়ে দুঃখ করা

তোমার সাজে না কবি। ভবিষ্যতের কথা বলো। তোমার মুখে ভবিষ্যতের কথা শুনতে বড় ভালো লাগে।

—ভবিষ্যৎ? —কবির চোখ দীপ্ত হয়ে উঠলো। আবেগ গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, সে রূপ যেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি সম্ভাবনাপূর্ণ।

গৌরীকান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তাহলে সেই ভয়ঙ্করের উদ্বোধন কর কবি। শ্মশানভূমিতে নবজীবনের বীজ অঙ্কুরিত হোক। বর্তমানের কোন সুযোগকে অবহেলা করা চলবে না। আমাদেরই রূপ দিতে হবে ভবিষ্যতকে।

—সাবাস! আমরাই তাকে রচনা করব। —কবি বললে, তার রূপায়ণে আমাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। না অহিংসার এজেণ্টরা আর না প্রতিক্রিয়াশীল দল।

—অহিংসার ওপর তোমার রাগ কি যাবে না?—গৌরীকান্ত হাসলে।

—আমি নিরামিষ বিপ্লবী নই। —কবি বললে, ভারতবর্ষ অহিংস থাকবে কিনা সেই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা আসন্ন বিপ্লবই করবে।—তার বাঁকা চোখে ফুটে উঠলো বিদ্রূপ। শাণিত কণ্ঠে সে বললে, ধর্মের কোটিং দেওয়া রাজনীতি এখনো চালাতে চাও নাকি? নতুন ভাবধারাকে গ্রহণ না করে আমাদের নিষ্কৃতি নেই জেনো!

"Move then with new desires,
For where we used to build and love
Is no man's land, and only ghosts can live
between two fires."

তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

স্তব্ধ গৌরীকান্ত তার দিকে রইল চেয়ে

নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটাচ্ছে কৃষ্ণা। যেন তার বুকে একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সঙ্কুচিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে তাকে করে তুলছে নিস্তেজ। চাপা গুমোট যেমন মানুষের অসহ্য হয়ে ওঠে তেমনি অসহ্য হয়ে উঠছে তার দিনগুলি। সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা তাকে তুলেছে অতিষ্ঠ করে।

একটা কথা থেকে থেকে তার মনে হয়। জীবনে যে কাজই সে করতে গেল আগ্রহভরে, সেই কাজেই পেলে দুর্জয় বাধা।

একসময় আদর্শ বধূজীবন যাপন করবার জন্য তার আকুলতার আর অন্ত ছিলো না। সীমাবদ্ধ আদর্শকে সম্মুখে রেখে সে কল্পনাকে করে তুলত রূপায়িত। গভীর সুখে তার বুক ভরে উঠত।

দোকানদার দুঃখমোচনকে সে ভালোবেসেছিল আর ভালোবেসেছিল তার ছোট সংসারটিকে।

তারপর ঘটনাচক্রে দুঃখমোচন চলে গেল যবনিকার অন্তরালে। ছোট্ট সংসারটি হয়ে গেল লুপ্ত। অদ্ভুত দীপ্তি আর অশেষ বিস্ময় নিয়ে আবির্ভূত হল বিকাশ।

এল আর এক জীবনের আহ্বান। বিপুল আর বিচিত্র জীবন। ঝড়ের মতো দুরন্ত আর সমুদ্রের মতো উদ্বেল।

সেই জীবনের মোহ সহস্রবাহু মেলে কৃষ্ণাকে করলে আকর্ষণ।

স্রোত বয়ে চলল উত্তাল কলোচ্ছ্বাসে। উদ্দাম ও সীমাহীন চাঞ্চল্য নিয়ে।

সেই চাঞ্চল্য কি আজ স্তিমিত হয়ে এল? কৃষ্ণার মনে প্রশ্ন জাগে।

সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। তার নিজেকে পরিশ্রান্ত বলে মনে হয়।

বিকাশের কথা তার মনে পড়ে। মনে পড়ে গৌরীকান্ত আর গোবর্ধনকে। কৃষকদের নির্বোধ দৃষ্টি আর নির্বিকার মুখ ফুটে ওঠে চোখের সামনে। তার ওপর তাদের কি একাগ্র নির্ভরতা?

সেই নির্ভরতাই তার জীবনের সান্ত্বনা।

বিস্মৃতির মতো প্রশান্ত আর মৃত্যুর মতো অতলস্পর্শ রাত্রি নেমে এসেছে তার জীবনে। সেই রাত্রিকে অতিক্রম করবার জন্য সে নিয়োজিত করে তার সমস্ত উদ্যম। যাত্রাপথে বহু অপরিচিত ও অজ্ঞাত মানুষের পদক্ষেপ তার অবলুপ্ত-প্রায় শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে বলে সে মনে করে।

যাদের সে ভালোবাসে, যাদের জন্য সে নিজের জীবন করেছে উৎসর্গ তাদের প্রীতিই তার পাথেয়।

তার ছোট সংসার হঠাৎ অনেক বড়ো হয়ে গেছে। চরিত্রগুলিও হয়েছে রূপান্তরিত।

শশীতারা অস্বাচ্ছন্দ বোধ করে। মন তার এমনি অশান্ত হয়ে ওঠে যে হৃষিকেশের গানগুলো পর্যন্ত তার আর গাইতে ভালো লাগে না।

তার চোখের সামনে সমগ্র জগতটা যেন ভূমিকম্পে তচনচ হয়ে গেল।

বঙ্কিম তার জীবনে এনেছিল একটা আনন্দ-ঘন অনুভূতি। কিন্তু সেই অনুভূতি অকস্মাৎ গেল হারিয়ে। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে কিছুদিন ধরে বয়ে চলল উত্তপ্ত ঘূর্ণীবায়ু।

বিক্ষুব্ধ গোপালনগর তার কাছে প্রহেলিকার মতো দুর্বোধ্য। পূর্বে এই প্রহেলিকাকে সে উপেক্ষা করত। কিন্তু এখন সে কৃষকদের বোঝবার চেষ্টা করে।

হতাশা আর উত্তেজনা তাদের কি বীভৎসই না করে তুলেছে! শিরাবহুল হাতের পেশীগুলো যেমন শীর্ণ হয়ে গেছে তেমনি কুৎসিত হয়ে উঠেছে তাদের চোখের দৃষ্টি। ক্রোধ, জিঘাংসা আর আতঙ্ক সেই দৃষ্টিকে করে তুলেছে ভয়ঙ্কর। পৃথিবীর জঘন্যতম কাজও যেন তারা নিঃসঙ্কোচে করতে পারে তাদের দিকে চেয়ে দেখলে এই কথাই মনে হয়।

কে তাদের এমন করে তুললে ? সবিস্ময়ে সে ভাবে।

তাদের সে স্বচ্ছন্দচিত্তে মাঠে যেতে দেখেছে আর দেখেছে অমানুষিক পরিশ্রম করতে। সদ্য-কাটা ধানের স্তূপের সামনে তাদের সাফল্যের হাসি এখনো তার মানসপটে হয়ে আছে অঙ্কিত।

তারা এমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো কেন ? তাদের অসহায় দৃষ্টির অন্তরালে কে জ্বালিয়ে দিলে উন্মাদ ক্রোধের আগুন ?

অভাবে আর অত্যাচারে তারা এমন হয়ে উঠেছে। এই সোজা কথাটা সে বুঝতে পারে। কিন্তু মনের কাছ থেকে এই উত্তর পেয়ে সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। অভাব ও অত্যাচার তো আগেও ছিলো ?

ছিলো সে কথা সত্য। ছিলো না তার তীব্রতাকে অনুভব করবার চেতনা। এই কথাটা সে জানেনা।

গোলা আর গুদাম জ্বালানোর জন্য বঙ্কিম মোকদ্দমা রুজু করেছে আদালতে। প্রধান আসামী গোবর্ধন। অন্যান্য আসামীর মধ্যে কৃষক সমিতির বাছা বাছা কর্মীরা আছে।

গোবর্ধন শশীতারাকে বলেছে, আমাকে আসামী করেছে কালোবামুন বঙ্কিমকে মাঝখানে রেখে। অনেকদিন থেকেই আমাকে জব্দ করবার চেষ্টায় সে ছিলো। এইবার সুযোগ পেয়েছে।

শশীতারা শঙ্কিত চিত্তে বলেছে, তোমার জেল হবে জ্যেঠা ?

—হবে বৈকি ! —গোবর্ধন হেসেছে।

তার হাসি শশীতারার ভালো লাগেনি। জেল হওয়ার কথায় এমন হাসি কেন ? কিন্তু ওদের সে বুঝতেও পারে না। ওদের অনেকেই আজকাল এইরকম হাসি হাসে যতো সাংঘাতিক কথা নিয়ে।

কৃষক আন্দোলনের তরঙ্গ তাকে এসে আঘাত করে। কৃত্তিবাস আবার মন প্রাণ দিয়ে লেগেছে সমিতির কাজে। তাদের বাড়ীর পিছনের

মাঠে মাঝে মাঝে গোপনে সভা হয়। গোপালনগরের প্রত্যেক কৃষক আসে সেই সভায়। অন্য গ্রাম থেকেও অনেকে আসে।

তার কাছে বর্তমানে এই সংবাদের কোন মূল্য নেই। একসময় সমিতির গোপন সংবাদ সে বঙ্কিমের কাছে প্রকাশ করত তার বাবার কাছ থেকে সংগ্রহ করে। আর কোন কারণে নয় শুধু বঙ্কিমকে তৃপ্ত করবার জন্যই এই কাজ সে করত। তাকে তৃপ্ত করে সে হত চরিতার্থ।

কিন্তু আজ আর তার কোন প্রয়োজন নেই। নিজের নির্বুদ্ধিতা আজ নিজের কাছেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিগত দিনের স্মৃতি তাকে লজ্জিত আর অনুতপ্ত করে তোলে।

উদয়তারার মতো যে বঙ্কিম তার জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল সেই তার জীবন ভরে দিয়েছে সুতীব্র অভিশাপে।

গোপালনগরের প্রত্যেকটি কৃষক এখন সমিতির সভ্য। সমিতিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে যারা থাকত লোকলোচনের অন্তরালে, তারাও সম্মুখে এগিয়ে এসেছে। সমিতির সংস্রবে আসতে যারা ভয় পেত তারা অকস্মাৎ হয়ে উঠেছে নির্ভীক।

তাদের এই পরিবর্তন শশীতারার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। সে তার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে।

বড় গাছে আশ্রয় নিতে সে আর যাবে না। তার ঘরের পাশের আগাছাগুলির গোড়াতেই করবে জলসিঞ্চন। বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আজ বুঝতে পেরেছে যে বঙ্কিম তার আত্মীয় নয়, তার আপনার এরাই। আবছা অন্ধকারে যাদের মুখে ফুটে উঠছে উগ্র উত্তেজনা। এরাই তার সগোত্র ও জ্ঞাতি। ধূপছায়া রঙের শাড়ী পরে, পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে বঙ্কিমের কাছে তার না গেলেও চলবে, কিন্তু এদের সঙ্গে আত্মীয়তা না রাখলে নিজেকেই করা হবে অস্বীকার। যে মাটিতে সে দাঁড়িয়ে আছে সেই মাটিই তাকে নিয়ে যাবে পাতালে।

তাই এদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথাই সে চিন্তা করছে। কৃষ্ণার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্য হয়ে উঠেছে ব্যগ্র। এই বিরাট কৃষক সমাজকে কৃষ্ণাই সচেতন করে তুলেছে সে কথা সে জানে। তার সান্নিধ্যে এসে চৈতন্যের প্রাখর্যে সেও জ্বলে উঠতে চায়।

গোপালনগর কেন্দ্রের ভার গৌরীকান্ত কবির ওপরেই দিয়েছিল।

কৃত্তিবাসের বাড়ীর পিছনের মাঠে সেদিন এক গোপন সভার অধিবেশন হচ্ছিল। কবি করছিল সভার কার্য পরিচালনা।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শশীতারা দেখছিল কবিকে।

অন্ধকার রাত্রি।

সমবেত লোকগুলির মধ্যে আত্মহারা যে তরুণ নিজের বক্তব্য বলে যাচ্ছে তাকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না। কিন্তু অস্পষ্ট একটি ইঙ্গিত সমগ্রভাবে এমনি একটি রূপের আভাষ প্রদান করছে যে স্পষ্ট করে তাকে দেখবার কোন প্রয়োজনই হয় না। প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝামাঝি একটা অনুভূতির মতো তাকে মনে হয়।

তার তন্ময়তা শশীতারাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল আর একদিনের কথা। সেদিন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেই বিলীয়মান স্মৃতি ছবির মতো জেগে উঠছিল তার মনে।

জানলার গরাদের মাঝখানে মুখ রেখে সে যেন চলে গেল বহুদূরে। কয়েক বছর ধরে চলে আসা পথ একনিমেষে অতিক্রম করে সে গেল পিছিয়ে। অতীতের অন্ধকার উঠলো আলোকিত হয়ে।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো দীর্ঘাকার এক তরুণের ছবি।

সরল গ্রাম্য কবি। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় সন্ত্রস্ত। বিদ্রূপের ভয়ে সচকিত। কিন্তু কি একাগ্রতা তার! কি গভীর তন্ময়তা!

প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শোনবার জন্য তার আগ্রহ হল। সে মনে মনে প্রত্যাশা করতে লাগলো যে গোবর্ধন তার কাছ থেকে কথাটার অর্থ ভাল করে জেনে নিক্।

কিন্তু গোবর্ধনের তার কোন প্রয়োজন ছিলো না।

কবিও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিছল। সে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ লক্ষ করলে শশীতারাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য সে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারলে না।

গোবর্ধন আর কৃত্তিবাস ছাড়া যে তৃতীয় শ্রোতার অস্তিত্বও সেখানে আছে সে কথা সে [illegible]থম আবিষ্কার করলে।

শশীতারা অনুভব করলে বিদ্যুতের তড়িৎ-স্পর্শ। দৃষ্টির বিদ্যুৎ তার সর্বাঙ্গে জাগিয়ে তুললে শিহরণ। সে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। এ যেন তার মহাজাগরণের মুহূর্ত। অজ্ঞাত পুলকের রোমাঞ্চ তাকে বিহ্বল করে তুললে। তৃপ্তির অমৃত-স্বাদে তার বুক উঠলো ভরে।

কিন্তু শশীতারার অদৃষ্টে বোধ হয় এই সুখটুকুও ছিলো না।

হঠাৎ বাইরে থেকে গোবর্ধনকে কে ডাকলে। ডাক নয়, সঙ্কেত। এই ডাকের বিশেষ একটি অর্থ ছিলো। সেকথা গোবর্ধন আর কৃত্তিবাসের মতো শশীতারাও জানত।

তার মুখ উদ্বেগে অন্ধকার হয়ে উঠলো।

গোবর্ধন বাইরে থেকে ফিরে এল। তারো মুখ উদ্বিগ্ন। কৃত্তিবাসের কাণের কাছে মুখ নিয়ে সে ফিস্‌ফিস্ করে কি বললে।

কবি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল গোবর্ধনের দিকে। কৃত্তিবাস গোবর্ধনকে কিছু বলবার আগেই সে বলে উঠলো, কোন বিপদের সংবাদ নাকি ?

—হ্যাঁ!—নিম্ন স্বরে বললে গোবর্ধন। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে তার মুখখানা হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর।

—কতদূরে আছে ?—মৃদুকণ্ঠে কবি বললে।

—খুব কাছে নেই। কিন্তু সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়ারও তো উপায় নেই।—গোবর্ধনের বিপন্ন কণ্ঠ থেকে কথাগুলো উচ্চারিত হল ধীরে ধীরে।

কবির চোখে ভাষাময় হয়ে উঠলো তীক্ষ্ণ তিরস্কার, সাবধান হওনি ?

—খুবই সাবধান হয়েছিলুম।—অপরাধীর মতো গোবর্ধন বললে, কোথা থেকে যে কি হল তার কিছু বুঝতে পারলুম না। গোটা দাসপাড়াটাই পুলিশে ছেয়ে ফেলেছে। সদর রাস্তা বন্ধ।

গোবর্ধন আর কৃত্তিবাস নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কি বলাবলি করতে লাগলো।

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কবি তৈরী হয়ে নিলে। তার হাতে চক্‌চক্ করে উঠলো একটা লোডেড্ রিভলভার। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে বললে, তাহলে হয়তো এই শেষ দেখা গোবর্ধন। যদি আর কোন পথ না থাকে তাহলে পুলিশ লাইনের ভিতর দিয়েই আমায় যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তার ফলে যদি আমার মৃত্যু হয় তো গৌরীকান্তকে খবরটা দিও।

তার চোখের গভীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়েছিল শশীতারা। ঘটনার জটিলতা তাকে এমনি অভিভূত করে ফেলেছিল যে সে হয়ে গিয়েছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু কবির কথাগুলো তার কাণে এসে ঢুকলো উত্তপ্ত সীসার মতো। তার চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অকস্মাৎ হয়ে উঠলো তীক্ষ্ণ।

গোবর্ধনকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে সে বললে কবির উদ্দেশে, পথ আছে। সদর রাস্তা দিযে যাওয়ার দরকার নেই।

এই প্রথম সে কথা কইলে প্রকাশ্যে। এতক্ষণ সঙ্কোচে কবির কাছ থেকে সে দূরে দূরেই ছিলো।

ব্যগ্র কণ্ঠে কবি বললে, তাহলে সেই পথটা আমায় দেখিয়ে দিন ?

গোবর্ধন আর কৃত্তিবাস বিস্মিত হয়ে চেয়েছিল শশীতারার দিকে গোবর্ধন বললে, কোন্ রাস্তার কথা বলছিস ?

—মানুষমারার জলা দিয়ে যে রাস্তাটা আছে।—শশীতারা বললে।

জিভে একটা অস্পষ্ট শব্দ করে কৃত্তিবাস বললে, অঃ! সে আর এখন পথ আছে নাকি? বর্ষায় সে তো গাঙ হয়ে গেছে! কলকাতার বাবু সেই গাঙ পার হতে পারবে?

—খুব পারবে।—শশীতারা ঝঙ্কার দিলে।

তার সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের ধারণা শুনে কবি মৃদু হাসলে। কিন্তু কিছু বললে না।

চিন্তিত চিত্তে গোবর্ধন বললে, একলা তো উনি সে পথ দিয়ে যেতে পারবেন না।

—একলা কেন যাবেন?—গোবর্ধন আর কৃত্তিবাসকে বিস্ময়চকিত করে বলে উঠলো শশীতারা, আমি ওঁকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

—তুই যাবি?—কৃত্তিবাস বললে।

শশীতারা উত্তর দিলে, আমি ছাড়া আর যাবে কে? বাড়ীতে যদি পুলিশ এসে ঢোকে তো তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য তোমায় থাকতে হবে না? জ্যেঠা তো চলে যাবে নিজের ঘরে।

—সেও তো বটে!—গোবর্ধন বললে। মনে মনে সে শশীতারার বুদ্ধির প্রশংসা করছিল। একবার তাকে আফ্‌শোষ করতেও শোনা গেল, আহা, তৈরী অন্ন আর খাওয়া হল না?

কৃত্তিবাস আর কিছু বললে না। কিন্তু শশীতারার কথাও সে প্রসন্নভাবে নিতে পারলে না।

কবি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। শশীতারাকে উদ্দেশ করে শুধু বললে, চলুন!

তারা দুজনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। বর্ষার মুখর রাত্রি। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে নিবিড় কালিমা। ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

শশীতারার আর কোন সঙ্কোচ ছিলো না। চুপি চুপি সে বললে, জুতো খুলে হাতে নিন। প্রথমে ছোট একটা ডোবা পার হতে হবে হেঁটে। তারপর জলা ভেঙে যেতে হবে। চারদিকেই শুধু জল।

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কবি বললে এই সাহসিকার দিকে চেয়ে, জল খুব বেশী নয় তো?

—এক হাঁটুর বেশী হবে না।

গাছের গুডি আর ইঁট বাঁধানো ঘাট পার হযে শশীতারার পিছনে পিছনে ডোবায় নামলো কবি।

অপরিচিত পথ আর রোমাঞ্চকর পরিবেশ।

পাঁকে কবির পা ডুবে যাচ্ছিল।

একখানা হাত বাডিযে দিয়ে শশীতারা বললে, আমার হাত ধরুন। অচেনা জায়গা। একটু এদিক ওদিক হলে পাঁকে ডুবে যাবেন।

কবি তার হাত ধরলে। সুন্দর আর সুগঠিত হাত।

সীমাহীন উদ্বেগের মধ্যেও সে একবার ভাববার চেষ্টা করলে যে রক্তাক্ত ও বন্ধুর যাত্রাপথে সে কি কখনো মনে মনে এমনি একটি সহচরীর কামনা করেছিল? দুর্গমের আহ্বানে যখন সে পদক্ষেপ করছে তখন কোন তরুণীর উত্তপ্ত স্পর্শ কি সে প্রত্যাশা করেছিল?

ডোবা পার হয়ে তারা পড়ল জলায়। বর্ষাব জলে জলা ভরে গেছে। বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দে তাদের পায়ের ছল ছল শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগলো। দিক নির্ণয় করে চললো শশীতারা। কবি করলে তাকে অনুসরণ।

অবশেষে তারা এসে উঠলো উঁচু একটা ডাঙা জমিতে।

শশীতারা কবিকে বললে, এই মাঠ ভেঙে সোজা পূবে গেলেই গঙ্গা

পাবেন। সেখান থেকে নৌকো করে কলকাতা যেতে কোন অসুবিধা হবে না।

ভাবতরঙ্গে কবির হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠছিল। সে বললে, তুমি কি করে ফিরবে ?

—আমি ঠিক ফিরব। আমার জন্যে ভাবতে হবে না।—আত্মবিস্মৃত কবির সম্বোধন আপনি থেকে তুমিতে এসে নেমেছে সেটুকু শশীতারার লক্ষ এড়াল না। কবির কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিলো না।

—তোমার জন্য আমার ভয় হচ্ছে !—কবি বললে।

শশীতারা চঞ্চল হয়ে উঠলো, মিছে সময় নষ্ট করছেন। আমার জন্য ভয় পাওযার কিছু নেই।

বিদ্যুতের এক ঝলক আলো মাঠের বুকে উঠলো কেঁপে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের গর্জনে বসুন্ধরা যেন স্তম্ভিত হযে গেল।

শশীতারা কাপড়ের ভিতর থেকে ছোট একটি পুঁটুলি বার করলে। বললে, অনেকখানি পথ যেতে হবে। আপনার খাওয়া পর্যন্ত হয়নি। এতে চিঁড়ে আর বাতাসা আছে, খাবেন। কখন খাবার জুটবে তার তো কিছু ঠিক নেই ?

কৃতজ্ঞতায় ও আবেগে কবির কণ্ঠ রুদ্ধ হযে গেল।

শশীতারা তাকে আর কিছু বলবার অবকাশ দিলে না। অকস্মাৎ সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো, আমি আর দেরী করব না। আরো দেরী করলে ওদিকে যদি কোন বিপদ ঘটে ? আমি যাই।

ছায়ার মতো সে অন্ধকারে গেল মিলিয়ে।

তার দিকে চেয়ে কবি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। জীবনে এই প্রথম সে যেন দুর্লভ একটা কিছু পেয়েছে। যা সে কোনদিন আশা করেনি। আকাঙ্খা করেনি। এক অবর্ণনীয় পরিপূর্ণতা তার অন্তর দিলে ভরিয়ে। রুদ্ধ আবেগে তার রিক্ত ও বঞ্চিত চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

বারো

দুর্ভিক্ষের সূচনা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। গোপালনগরের মাঠ অতিক্রম করে বহু লোক যেতে আরম্ভ করলে ষ্টেশনের দিকে। বহুদূর থেকে তারা আসছে। তাদের জমি সৈনিকেরা করেছে দখল। কুটীরে জীবনধারনের সম্বল নেই। সহায়-সম্পদহীন নিঃস্ব নরনারীর মিছিল! ছেঁড়া কাঁথা আর ভাঙা মন নিযে তারা বেরিয়ে পড়েছে শিশু পুত্রকন্যার হাত ধরে। যতদিন পেরেছে ততদিন তারা ঘরের ভিতরেই ছিলো। কিন্তু আর উপায় নেই। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার এই অভিযান। হতাশা ও ক্লান্তি তাদের এই অভিযানে বেরোতে করেছে বাধ্য।

কলকাতার কথা তাদের কানে এসেছে। যুদ্ধের দৌলতে সেখানে নাকি আর কেউ বেকার নেই। কাজ করবার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝি চাকরেরও এমন চাহিদা যে তাদের পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। মজুরীর হারও বেড়েছে। লাইন দিলে চালও পাওয়া যাচ্ছে।

এমন চমৎকার ব্যবস্থার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। তাই দলে দলে লোক ছুটছে।

ওদিকে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি জার্মান সেনার পদভরে হয়ে উঠেছে আরো উত্তপ্ত। চট্টগ্রাম আর ফেনী বিধ্বস্ত করছে জাপানী বোমারু। আরাকানে সৈন্য চলাচল সুরু হয়েছে। এই সব সংবাদের টুকরো উদ্দাম হাওয়ায় উড়ে আসছে গোপালনগরে।

হাওয়া ছাড়া গোপালনগরে আর কিছু নেই। ক্ষেত, খামার শূন্য। সিক্ত মৃত্তিকার বুকে দুর্বাদলের সবুজ গালিচা। সেই গালিচা নয়নাভিরাম। কিন্তু সেই দৃশ্য দেখে সেখানকার মানুষগুলির চোখে জ্বলে ওঠে বঞ্চনার দাহ।

সৈন্যাবাসগুলি সৈনিকেরা পূর্ণ করে ফেলেছে।

তাদের ব্যবহারের জন্য পথ হয়েছে প্রশস্ততর। মিলিটারী ভ্যান আসা যাওয়া করছে মিনিটে মিনিটে। তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কয়েক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হয়েছে। আর এসেছে অনেক বেশ্যা। তাদের নিয়ে সৈনিকদের উদ্দাম মাতামাতি শুধু চক্ষুপীড়াদায়ক নয়, রীতিমতো বিরক্তিকর। পাশবিক লালসার কুশ্রী চেহারা ফুটে উঠেছে তার সমস্ত জঘন্যতা নিয়ে। যাদের মনে কোন নীতিবোধের বালাই নেই তারাও শিউরে ওঠে সৈনিকদের দুর্নীতিপরায়ণতায়।

দেশে হয়তো এদের কেউ ছাত্র ছিলো, কেউ বা ছাত্রজীবন শেষ করে প্রবেশ করেছিল কর্মজগতে। তাদের ঘর ছিলো। ছিলো সংসার। মা, ভাই বোন আর স্ত্রী।

আর ছিলো আদর্শ। বৃহৎ ও মহৎ আদর্শ। যে জন্য তারা সমুদ্র পার হয়ে ছুটে এল জীবন উৎসর্গ করবার পবিত্র সঙ্কল্প নিয়ে।

তারপর তাদের পায়ের নীচে জমে উঠতে লাগলো শবদেহ আর ধ্বংসস্তূপ।

স্বজন, সুহৃদ আর প্রিয়াকে নিয়ে একদা যারা নীড় রচনার স্বপ্ন দেখত, ন্যায় ও নীতি নির্ধারিত করত যাদের জীবনের গতি, তারা হয়ে উঠলো বেপরোয়া। তাদের ফাঁপানো আদর্শবাদ যে চোরাবালির ওপরে দাঁড়িয়েছিল তার ভিত্তি গেল ধ্বসে। তারা বিসর্জন দিলে ন্যায় ও নীতিবোধ। স্বজন, সুহৃদ আর প্রিয়ার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে হল অসমর্থ।

মৃত্যুভয় এই মনোবৃত্তির সৃষ্টি করলে।

এই অমানুষগুলির সঙ্গে আমাদের দেশীয় অমানুষগুলির সম্পর্কও হয়ে উঠেছে গভীর। কালাচাঁদ আজকাল সৈনিকদের তাঁবুতে যাতায়াত করছেন। গোপালনগরের একপ্রান্তে কয়েক ঘর বাগ্দী আর কাওরার বাস। সেই বাগ্দী আর কাওরা পাড়ায় সৈনিকদের অবাধ গতিবিধি

কালাচাঁদের অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। বাগ্দী ও কাওরা তরুণীরা দামী শাড়ী পরে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় চটুল দৃষ্টি মেলে। মূল্যবান প্রসাধনে তাদের পরিপুষ্ট যৌবনশ্রী হয়ে ওঠে উজ্বল। উচ্ছল হাসি ও কথাবার্তায় তারা তাদের অপরাধের গুরুত্বকে ঢেকে রাখতে চায়। লীলা-লাস্য বিজড়িত মনোহর দেহভঙ্গীমায় কদর্য কামনাকে উদগ্র আর উগ্র করে তোলবার পদ্ধতি আয়ত্ব করে তারা যেন জীবনের একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছে।

দুরূহ সমস্যা বৈকি!

দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, নেই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কিন্তু সৈনিকদের অনুগ্রহে তাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ! চরম মূল্যে তারা ক্ষুন্নিবৃত্তির সমস্যার সমাধান করেছে।

সৈনিকমহলে কালাচাঁদ নিজেকে করেছেন প্রতিষ্ঠিত। নারীলোলুপদের নারী সংগ্রহ করে দিয়ে তিনি অর্থাগমের পথ করেছেন উন্মুক্ত। তাদের অনুগ্রহে চোরাবাজারেও তিনি অনেক জিনিষ বিক্রী করছেন। অর্থ আসছে অজস্র।

অজস্র অর্থই তিনি চান। গৌরীকান্ত তাঁর প্রত্যাশা ভঙ্গ করেছে। বঙ্কিম করেছে আঘাত তাঁর প্রতিজ্ঞার ভিত্তিমূলে।

আর চলেছে তাঁর প্রতিহিংসা সাধনের কাজ।

প্রথমে বিকাশ ছিলো তাঁর শত্রু। তারপর হল কৃষ্ণা আর গোবর্ধন। এখন গোপালনগরের সমগ্র মাহিষ্যসমাজ তাঁর শত্রু হযে দাঁড়িয়েছে। ছলে, বলে ও কৌশলে তিনি তাদের জমি খাস করে নিচ্ছেন। বাকী খাজনার দায়ে নালিশ করে তাদের করছেন ভিটামাটিছাড়া। তাদের নিঃস্ব ভিক্ষুকে পরিণত করবার জন্য তিনি নিজে তো কোমর বেঁধেছেনই, তার ওপর জ্ঞাতিদের পর্যন্ত এই কাজে প্ররোচিত করছেন। গোপালনগরের ব্রাহ্মণরা আজ মাহিষ্যদের শত্রু।

মাহিষ্য মেয়েদের দিকেও তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। প্রতিহিংসা সাধনের এ একটি অমোঘ পন্থা! কিন্তু সেই পথে পদক্ষেপ করতে তাঁর সাহস হয়নি। কৃষক সমিতিকে তিনি ভয় করেন।

তাঁর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে কিন্তু এই ভয়ই প্রতিমুহূর্তে উত্তেজিত করছে।

এদিকে বঙ্কিমের চিত্তের অস্বাচ্ছন্দ্য যাচ্ছে বেড়ে। সে ক্লান্তিবোধ করছে। তার মনে হচ্ছে যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী সে হারিয়ে ফেলছে। ভুলে গেছে সরলভাবে চিন্তা করতে। তার দেহের স্নায়ু যেন হয়ে পড়েছে দুর্বল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস-ডি-ও আর পুলিশ সাহেব; মেজর জেনারেল, ক্যাপ্টেন আর সেকেণ্ড লেফ্‌টন্যাণ্ট; এদের সাহচর্য আর ভালো লাগছে না। প্রচুর অর্থোপার্জন করা, সেও যেন কেমন বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠেছে। গোপালনগরের আর কোন আকর্ষণই নেই। পোড়ো-জমির মতো এই গ্রামখানাকে পরিত্যাগ করে যেতে পারলে সে যেন বাঁচে।

ভবিষ্যতকে তার দুর্নিরীক্ষ বলে মনে হয় আর বর্তমানকে অস্পষ্ট।

শশীতারাকে সে অবশ্য ভোলেনি। কিন্তু সে তার আর এক যন্ত্রণা। তার কথা মনে হলে নিদারুণ ঘৃণায় তার মর্মমূল অবধি আরক্ত হয়ে ওঠে। বিশ্লেষণ করে সে এর কোন কারণ খুঁজে পায় না।

একদিন যার সাহচর্য তাকে উল্লসিত করে তুলত আজ তার চিন্তাও তার কাছে অসহ্য। সে বিস্মিত হয়ে ভাবে, কেন এমন হল? জীবনের সমস্ত আনন্দ তার কাছে বিষ হয়ে উঠলো কেন?

বহু চিন্তাতেও সে এর কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ কখনো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে হৃষিকেশের ছায়ামূর্তি। অবিকল সেই আগেকার হৃষিকেশ। তার শৈশব কৈশোর আর প্রথম যৌবনের সাথী। মৃত্যুর পরেও তার চেহারার কোন পরিবর্তন হয়নি।

অবিকৃত একটা 'মমী'র মতো সে স্থির ও তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বঙ্কিমের দিকে।

সে ক্রোধে জ্বলে ওঠে। শশীতারার সঙ্গে তার সেদিনকার আচরণের কথা মনে পড়ে যায়। কি বীভৎস আনন্দই না তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল? নির্মম একটা প্রতিশোধ নিয়েছে এই ভেবে তার আত্মপ্রসাদের আর অন্ত থাকে না।

কিন্তু সে আত্মপ্রসাদ সাময়িক।

শশীতারার তন্ময়তার কথা তার মনে পড়ে। সেই তন্ময়তাকে সে তার প্রতি উপেক্ষা বলেই গ্রহণ করেছে। হৃষিকেশের রচিত গান গাইতে গাইতে শশীতারা তার দিকে চেয়ে দেখবার অবকাশ পর্যন্ত পায়নি। সে কথা সে ভুলতে পারে না।

এই আঘাতকে প্রত্যাঘাত করবার মতো কোন অস্ত্র কি তার তূণে আছে? তার মনে হয় নেই।

পরাজয়ের মর্মবেদনা তাকে ম্রিয়মান করে তোলে।

গোপালনগরের সাধারণ মানুষগুলিও অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিবেশের মধ্যে কাটাচ্ছে বৈচিত্রহীন দিন।

ঘনায়মান অন্ধকারে তাদের অশ্রুর অঞ্জলি নিবেদিত হচ্ছে অজ্ঞাত বিধাতার উদ্দেশে। বিধাতা নির্বিকার। তাদের অশ্রু জমাট বেঁধে উঠছে কঠিন হয়ে।

একটা তীব্র বিদ্বেষের জ্বালা তারা ভোগ করছে অহর্নিশ। বিদ্বেষ তাদের বেঁচে থাকবার অবলম্বন হয়ে উঠেছে। তাদের বিদ্বেষ গভর্ণমেণ্টের ওপর, পুলিশের ওপর, ব্রাহ্মণদের ওপর এবং হয়তো তাদের নিজেদেরও ওপর। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে তারা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে চায়। এই সমাজের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে অভিযোগ।

তারা পদক্ষেপ করছে অজ্ঞাত ও অন্ধকার পথে।

আর সেই অজ্ঞাত ও অন্ধকার পথের পথিকদের নিয়ে সম্মুখে পদক্ষেপ করছে হৃতশ্রী ভারতবর্ষ বিপ্লবের ক্ষুরধার ও রক্তাক্ত পথে। সারা পৃথিবী তার দিকে চেয়ে হয়ে উঠেছে কৌতূহলী।

বঙ্কিমকে বাধা দিলেন কালাচাঁদ। বললেন, সে কি হয়? এই বয়সে তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবে কোন দুঃখে? কিসের অভাব তোমার? উপায় করছ যথেষ্ট। যে থা করো, সংসারী হও।

বঙ্কিম মৃদু হাসলে। বললে, এ কথাগুলো বলতে হয়, না জ্যেঠামশাই? না বললে সামাজিক ভদ্রতায় বাধে! তাই না? কিন্তু আমার যে আর মন টিকছে না। আমায় যেতেই হবে।

কালাচাঁদের ললাটের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, সামাজিক ভদ্রতার খাতিরে আমি তোমায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে বারণ করছি শেষে তোমার এই ধারণা হল?—তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, আমার অদৃষ্ট! না হলে তুমিও আমায় পর ভাবো? গৌরী চলে যাওয়ার পর থেকে আমার মনের অবস্থা কি রকম যাচ্ছে তা যদি তুমি জানতে?

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বঙ্কিমের হাসি পেলে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করে বললে, না, না। আপনাকে আমি পর ভাবিনি। আপনি দুঃখ করবেন না।

—দুঃখ করা ছাড়া আমার আর কি করবার আছে?—কালাচাঁদ ম্লান হাসি হাসলেন।

এই অভিনয় বঙ্কিমের ভালো লাগছিল না। কালাচাঁদকে সে চেনে। সে বললে, এখন আর যাওয়া বন্ধ করা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা

তোলার বন্দোবস্ত পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছি বাইরে যাবো বলে। বোম্বায়ের একটা হোটেলে টেলিগ্রাফ করে ঘরও ঠিক করেছি। এতটা এগিয়ে গিয়ে কি আর পিছিয়ে আসা যায়?

কালাচাঁদের চোখের দৃষ্টি কুটীল হয়ে উঠলো। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, এতখানি এগিয়েছ? তোমরা ছেলে ছোকরারা আগু পিছু ভেবে কাজ করো না। মামলার কি হবে?

বঙ্কিম জানে কালাচাঁদের আসল ব্যথা কোথা। সে দ্বিধা না করে অম্লান বদনে বললে, মামলা তুলে নোব।

—তুলে নেবে?—কালাচাঁদ আঁৎকে উঠলেন। কথাটা বিশ্বাস করতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না।

বহু আয়াসে, জীবনের সমস্ত ইতিহাস মন্থন করে তিনি নিখুঁত ভাবে সাজিয়েছিলেন মামলাটি নিপুণতার সঙ্গে। এই মামলায় গোবর্ধনের আর অন্যান্য আসামীদের অন্তত দুবছর করে যে সশ্রম কারাদণ্ড হবে সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। আসামীরা এখন জামিনে খালাস আছে। কৃষক সমিতির উদ্যোগ আয়োজনের ফলে কোর্ট আসামীদের জামিন দিতে বাধ্য হয়েছে। কলকাতা থেকে উকিল আনিয়ে তারা তদ্বির করছে।

কিন্তু কোন তদ্বিরেই কিছু হবে না সেকথা কালাচাঁদের চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না। কারণ এই মামলার স্রষ্টা তিনিই। বঙ্কিমের গোলা ও গুদামে আগুন লাগানো এবং তাকে দিয়ে মামলা দায়ের করা এ সব তাঁরই কীর্তি।

এই ষড়যন্ত্র সফল করে তোলবার জন্য তিনি কি কম পরিশ্রম করেছেন! জীবনে বোধ করি কোন মামলার পিছনেই তিনি এতখানি উদ্যম ও অধ্যবসায় নিয়োগ করেননি।

সে সব বৃথা হবে? তাঁর গলা শুকিয়ে উঠলো। বহু বিনিদ্র রজনীর

চিন্তা, তীব্র প্রতিহিংসার জ্বালা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? তাঁর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো কাতরতা। তিনি বললেন, এ কাজ করো না বঙ্কিম।

বঙ্কিম এজন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলো। সে জানত কালাচাঁদ তাকে তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতে চাইছেন। তাঁর এই অসম্ভব প্রয়াসকে সে বাধা দেয়নি। শুধু অপেক্ষা করছিল কতদূর তিনি যান তাই দেখবার জন্য। ঔদ্ধত্য আর অহমিকা তাকে চঞ্চল করে তুললেও তার বুদ্ধিবৃত্তি তাকে করেছিল সহিষ্ণু। কিন্তু এই সহিষ্ণুতার শেষে সে আজ অকস্মাৎ টেনে দিলে ছেদ। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে—যা তার স্বাভাবিক কথা বলার ভঙ্গি, বললে, দু'চারটে চাষাকে আমি গ্রাহ্য করি না জ্যেঠামশাই, গোলা আর গুদাম পুড়িয়ে তারা আমার কি ক্ষতি করতে পারে? এ রকম ক্ষতি তো আমার অন্য ভাবেও হতে পারত। ধরুণ, যদি দৈবাৎ আগুন লাগত। মামলার পিছনে যে অর্থ আর সময় আমাকে নষ্ট করতে হবে সেই অর্থ আর সময় দিয়ে আমি তার চোদ্দগুণ অর্থ উপায় করব। কুড়ি, পঁচিশ বছর বাদে এক একটা যুদ্ধ হয়। মানুষ উপার্জন করবার সুযোগও পায় কুড়ি পঁচিশ বছর পরে পরে। সুতরাং এখন অর্থ ও সময় নষ্ট করা মানে কুড়ি পঁচিশ বছরের উপার্জনও নষ্ট করা। তুচ্ছ একটা মামলার জন্য আমি এত বড়ো ক্ষতি করতে পারব না জ্যেঠামশাই।

কালাচাঁদের মুখ কালো হয়ে উঠলো। তাঁর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের গতি এভাবে যে রুদ্ধ হবে সে কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করবার একটি মাত্র অস্ত্র তার তূণে ছিলো, সে হচ্ছে মোকদ্দমা। এই একাগ্নিকে আজীবন সুকৌশলে পরিচালনা করে তিনি শত্রুজিৎ। যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি এ পর্যন্ত সিদ্ধকাম হয়েছেন সেই সুপরীক্ষিত পদ্ধতি এবারও অবলম্বন করেছেন নিভুর্ল ভাবে। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর অব্যর্থ অস্ত্রের অমোঘ গতি রুদ্ধ করতে চায় কেন?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি শেষ টোপ ফেললেন। বললেন, বোম্বায়ে গিয়ে কি কিছু লাভ হবে ?

—একটা বড়ো কণ্ট্রাক্ট পাওয়ার আশা আছে। —বঙ্কিম বললে।

কালাচাঁদ বললেন, সেই অনিশ্চিতের পিছনে না ছুটে তুমি এখানে যা করছ তাই করো না কেন। মামলার খরচপত্রের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। খরচ আমিই চালাবো। অবশ্য তোমার সময় একটু নষ্ট হবে। ফরিয়াদীকে আদালতে উপস্থিত হতে বে তো ? তবে তোমার অর্থ নষ্ট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব।

এত বড়ো ভুল চাল কালাচাঁদ আর কোনদিন চালেন নি।

উদ্ধত ও দাম্ভিক বঙ্কিমের অন্তরাত্মা গর্জন করে উঠলো। সে চীৎকার করে বললে, কি বললেন ? আমার অর্থ যাতে না নষ্ট হয় তার ব্যবস্থা আপনি করবেন ? খরচ আপনি চালাবেন ? মিলিটারী ক্যাম্পে মেয়েমানুষ চালান করে আপনি কত টাকা করেছেন জ্যেঠামশাই ? আপনি কি ভুলে গেছেন যে সত্তর বিঘা ধানজমি আমি আপনাকে বিনা সর্তে দান করেছি ? আমার দান আপনি গ্রহণ করেছেন কিন্তু আপনার দান আমি গ্রহণ করব একথা ভাববার সাহস আপনার হল কোথা থেকে ?

কালাচাঁদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি এতই উগ্র হয়ে উঠেছিল যে তিনি কি বলছেন এবং তার অর্থ কি সে কথা চিন্তা করবার অবকাশ ও তাঁর ছিলো না। কিন্তু সেজন্য বঙ্কিম যে তাঁকে এভাবে অপমান করবে সে কথা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিলো। মাত্র একটি চিন্তা তাঁকে বিব্রত করে তুলেছিল। গোবর্ধন ও তার দলবলকে এ যাত্রা সাজা না দেওয়াতে পারলে তার পরিণামের কথা চিন্তা করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিল। তাঁর ষড়যন্ত্র তিনি সফল করে তুলতে চাইছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের সাফল্য তাঁর গৌরীকান্তকে হারাণোর দুঃখকেও ম্লান করে দিত।

তীব্রস্বরে বঙ্কিম বললে, আপনি যান জ্যেঠামশাই, আর কোনদিন এখানে আসবেন না। আর এই কথা জেনে যান যে মামলা আমি আর চালাবো না। আমি জানি মামলায় আমার চেয়েও আপনার স্বার্থ বেশী। এত নির্বোধ আমি নই যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারব না। কোন কিছুই আমার জানতে বাকী নেই। শুধু প্রয়োজন হয়নি বলেই এতদিন কিছু প্রকাশ করিনি। আজ স্পষ্ট করেই আপনাকে বলে দিচ্ছি যে আমার সুনাম, সময় আর অর্থ নষ্ট করে আপনার স্বার্থরক্ষা করতে আমি পারব না।

তীব্র মর্মদাহ নিযে কালাচাঁদ বেরিয়ে গেলেন বাইরে। তাঁর কানের ভিতর ঝাঁ ঝাঁ করছিল। উত্তেজিত মস্তিষ্কে তিনি একবার ভাববার চেষ্টা করলেন, সত্তর বিঘা ধানজমি বিনাসর্তে দান করার শোধ কি এইভাবেই বঙ্কিম নিলে?

শশীতারা ফিরলো তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে।

তাদের বাড়ীতে পুলিশ ততক্ষণে এক দক্ষযজ্ঞের সৃষ্টি করেছে। গোটা বাড়ীখানা খানাতল্লাসী হচ্ছে। দাওয়ার এক কোণে একখানা জলচৌকীর ওপর জাঁকিয়ে বসেছেন থানার বড়বাবু। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কৃত্তিবাস। দুজন কনষ্টেবল তার দুদিকে দাঁড়িয়ে।

খিড়কীর পথে বড়বাবু শশীতারাকে ঢুকতে দেখেছিলেন। সরোষে গর্জন করে তিনি বললেন, এইবার বুঝতে পেরেছি! ওঃ, কি শয়তানী মতলব? রতন?

রতন দৌড়ে এল, হুজুর?

—জনকতক সিপাইকে নিয়ে তুমি পিছনের বাগানটাগানগুলো তল্লাসী করো। ওইপথেই আসামী সরেছে। এখনো চেষ্টা করলে ধরা যাবে।

চারজন কনষ্টেবল নিয়ে রতন দৌড়ুলো বাগানের দিকে।

বড়বাবু কৃত্তিবাসের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, বল্ হারামজাদা, সব কথা খুলে বল্। নাহলে চাব্‌কে পিঠের ছাল খুলে নোব!

—এজ্ঞে বল্‌ছি তো, আমি কিছু জানিনা।—কৃত্তিবাস বললে।

—জানিস্ না? জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোবো জানিস! মেয়েকে দিয়ে আসামী সরিয়ে দিয়ে এখন সাধু সাজা হচ্ছে? তোর চেয়ে ঢের বড় বড় বদ্‌মাইসকে আমি টিট্ করেছি। তুই তো কোন ছার?

লাঞ্ছিত পিতার দিকে চেয়ে রইল শশীতারা।

কেরোসিনের ম্লান আলোয় কৃত্তিবাসকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। সে ভয় পেয়েছে কিনা সেকথা শশীতারা ঠিক বুঝতে পারলে না। কিন্তু তার আশঙ্কা হল যদি সত্যসত্যই তার ওপর নির্যাতন আরম্ভ হয়?

কৃত্তিবাসের প্রকৃতি তার অজ্ঞাত নয়। সে যতদিন পেরেছিল কৃষক আন্দোলন থেকে দূরে ছিলো। নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ জীবনের প্রতি তার একটা মোহ আছে। নির্যাতনের ভয়ে যদি সে সব কথা বলে ফেলে? শশীতারার মুখে ঘনিয়ে উঠলো উদ্বেগের ছায়া।

আর পাঁচজন কৃষকের মতো প্রথমে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল দলে পড়ে। তারপর বঙ্কিমের সংস্রবে এসে আন্দোলন থেকে সে শুধু সরে গেল না, আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও করলে। নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে সে শশীতারার সঙ্গে বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

অবশ্য এই ব্যাপারে শুধু কৃত্তিবাসের নয় শশীতারার নিজেরও দোষ আছে।

শশীতারার অন্তরাত্মা আতঙ্কে উঠলো কেঁপে। কৃত্তিবাস কি আবার বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তার দিকে চেয়ে দেখলে। মুখখানা স্পষ্ট দেখা

যায় না। আবছা অন্ধকারে তার সেই কুঞ্চিত মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা ফুটে উঠেছে কিনা শশীতারা সেকথা কল্পনা করতে লাগলো মনে মনে।

তার মনে পড়ল তার সঙ্গে বঙ্কিমের অসম্মানজনক আচরণ সে ক্ষমা করেনি। যে চাকরীর জন্য সে বিশ্বাসঘাতকতা পর্যন্ত করেছিল সেই চাকরী ছাড়তে তার একমুহূর্তের বেশী সময় লাগেনি। অসঙ্কোচে জীবনের নিশ্চিন্ত আরামকে সে পরিত্যাগ করে এসেছিল। সেদিন তার ছোট ছোট চোখ দুটো শুধু জ্বলছিল আর ফুলে উঠছিল দেহের লৌহ-কঠিন পেশীগুলো।

পুনরায় সে যোগ দিলে কৃষক আন্দোলনে।

এর পরেও তার দ্বারা কি আবার বিশ্বাসঘাতকের কাজ করা সম্ভব?

আশা আর নিরাশার মাঝখানে দুলতে লাগলো শশীতারার চিত্ত।

জলায় কবিকে পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে এসেছে মনে সঙ্গীতের সুরের মতো মধুর একটি মুর্চ্ছনা নিয়ে। ভাষাহীন এক অপরূপ অনুভূতি তার অন্তরের নিভৃতে জাগিয়ে তুলেছে বিচিত্র আনন্দের উচ্ছ্বাস। তার চিত্তের সবগুলি তার আর কখনো এমনভাবে একসঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠেনি।

অশ্রান্ত বর্ষণ মাথায় করে, বজ্র আর বিদ্যুৎকে উপেক্ষা করে সে ফিরে এসেছে তন্ময় হয়ে জীবনের আনাস্বাদিত আনন্দকে আস্বাদন করতে করতে।

কিন্তু বিস্বাদ মুহূর্তগুলির স্পর্শে তার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত সুরের তরঙ্গ গেল স্তব্ধ হয়ে। শব্দহীন একটা আর্তনাদে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল তার বিচিত্র অনুভূতি।

বড়বাবু কৃত্তিবাসকে একটা লাথি মারলেন। বুট পরা পায়ের প্রচণ্ড লাথি! কৃত্তিবাস দাওয়া থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল উঠানে।

শশীতারা আর্তনাদ করে উঠলো।

গর্জন করে বড়বাবু বললেন, ওই ছুঁড়িটাকে এবার এখানে নিয়ে আয়!

শশীতারাকে আনতে হল না, সে নিজেই অগ্রসর হয়ে এল।

কেরোসিনের ম্লান আলোয় বড়বাবু তার দিকে চেয়ে দেখলেন। কবিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সে গাছকোমর বেঁধে কাপড় পরেছিল। বড়বাবুর চোখে পড়ল কাপড়ের ভাঁজে ভাজে সুগঠিত তনুর রহস্যময় ইঙ্গিত। সিক্ত বস্ত্র দেহের প্রত্যেক রেখাকে তুলেছে স্পষ্ট করে। অশ্রান্ত বর্ষণে তার অজস্র কেশরাশি বিপর্যস্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে পিঠে। মুক্তার মতো মুখে ফোঁটা ফোঁটা জল রয়েছে জমে।

এই বিস্রস্তবেশা সুন্দরী তরুণীর দিকে চেয়ে বড়বাবু আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। তাঁর রোষ-কষায়িত চোখের দৃষ্টি সহসা হয়ে এল শান্ত।

তাঁর দৃষ্টির সামনে শশীতারা উঠলো সন্ত্রস্ত হয়ে।

কৃত্তিবাস ততক্ষণে উঠানের ওপর উঠে বসেছে।

তাকে বার বার প্রশ্ন করে বড়বাবু একটি কথারও উত্তর পাননি। শশীতারার সমস্ত সংশয় ও আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে শুধু একটি কথারই সে প্রতিধ্বনি করেছে প্রতিবার, আমি কিছু জানি না।

তার এই উত্তর শশীতারাকে যে পরিমাণে আশ্বস্ত করেছে ঠিক সেই পরিমাণে উদ্বিগ্নও করেছে। এর পরে কৃত্তিবাস কি বলবে সে শুধু সেই কথাই ভাবতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কৃত্তিবাস আর কিছু বলেনি।

একটা অসহায় জন্তুর মতো সে বসে আছে উঠানে।

প্রচণ্ড লাথির আঘাত সম্ভবত সে ভুলতে পারছে না। শশীতারাও পারেনি। এই আকস্মিক আঘাত শুধু কৃত্তিবাসকে নয় তাকেও অভিভূত করে দিয়েছে। লাথি? ওঃ কি স্পর্ধা?

শশীতারার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠছে।

সে মনে মনে ভাবতেও চেষ্টা করছে, বড়বাবু তাকে প্রশ্ন করলে সে কি উত্তর দেবে। কৃত্তিবাসের মতো সেও কি, বলবে 'কিছুই জানি না।' কিন্তু

শশীতারা অবসন্ন বোধ করছিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, আমাকে কোথায় যেতে হবে ?

—বড়বাবুর ঘরে ! সেখানে তোর এজাহার হবে।—রতন সশব্দে হেসে উঠলো। ক্রূর দৃষ্টি মেলে সে বললে, তোর বরাত ভালো, বড়বাবুর নজরে পড়ে গেছিস। দেখিস, পরে যেন আমাদের ভুলে যাসনি।

রতনের কথায় এবং হাসিতে শশীতারার অন্তরাত্মা অবধি শিউরে উঠলো। হতবুদ্ধি হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল স্থানুর মতো।

রতন বললে, দাঁড়ালি যে ?

—আমি যাবো না।—শশীতাবা বললে।

—না গেলে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে।—রতনের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। সে শশীতারার একটা হাত ধরে বললে, চল্।

ঘৃণায় শশীতারার সমগ্র অন্তর যেন রি রি করে উঠলো। সে এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিলে।

রতন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, যাবি কি না ?

কি ভেবে শশীতারা বললে, চলো, যাচ্ছি। সে অগ্রসর হল কম্পিত পদে। আত্মস্থ হয়ে সে যেন কিছু পরিমাণে সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে।

পাশেই বড়বাবুর ঘর।

রতন শশীতারাকে ঠেলে দিলে একেবারে সেই ঘরের ভিতরে।

চেয়ারে বসে বড়বাবু সেইমাত্র একটি বোতল শেষ করেছেন। তাঁর লম্বা গোঁফের ডগা ছুঁচালো হয়ে উঠেছে। শশীতারার দিকে চেয়ে জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, এসো, এসো। এখানে বসো।—পাশের চেয়ারখানার দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

শশীতারা দাঁড়িয়ে রইল। তার সারা দেহ ঝিমঝিম করছিল।

—দাঁড়িয়ে রইলে যে ?—বড়বাবু উঠে টলতে টলতে এসে তার একখানা হাত ধরলেন।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আর্তকণ্ঠে শশীতারা বললে, আপনার আসামীকে সত্যিই আমি পালিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছি। আমি দোষ স্বীকার করছি। আমায় জেলে দিতে হয় দিন, কিন্তু এরকম করে অপমান করবেন না।

—অপমান ?—স্খলিত কণ্ঠে বড়বাবু বললেন, অপমান করলুম আবার কই! খাসা এজাহারটি যেমন দিলে তেমনি সোজা এই চেয়ার-খানায় বসে পড়ো দেখি। এক গ্লাস খাও আমার সঙ্গে। অপমানকে আর অপমান বলে মনে হবে না, বরং আমি তোমায় সম্মান করছি ভেবে তুমি আনন্দিত হয়ে উঠবে।

শশীতারার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো। কাতর কণ্ঠে সে বললে, আমাকে মাফ করুন।

—সময় নষ্ট করো না।—বড়বাবু অধীর হয়ে উঠলেন। কালাচাঁদের কাছ থেকে শশীতারা ও বঙ্কিমের প্রণয়ের ও তার পরিণতির পল্লবিত কাহিনী তিনি শুনেছিলেন। বললেন, এরকম অপমানে তুমি তো অভ্যস্ত ? বঙ্কিমবাবুর বেলায় যখন আপত্তি করোনি তখন আমার বেলায় করলে চলবে কেন ?

একটা হিংস্র জন্তু যেন শশীতারার সামনে দাঁড়ালো থাবা উদ্যত করে। সে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

বড়বাবুর আর বিলম্ব সহ্য হল না। দু'হাত উদ্যত করে তিনি শশীতারাকে টেনে নিলেন বুকের ভিতরে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে একটা শব্দ হল। বিস্মিত বড়বাবু ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই ধাক্কায় দরজার খিলটা ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলে কৃত্তিবাস আর গোবর্ধন। তাদের দুজনেরই হাতে লাঠি।

দু'গাছা লাঠিই এক সঙ্গে পড়ল বড়বাবুর মাথায়। তিনি

সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গেলেন। ঘর রক্তে ভেসে যেতে লাগলো।

শশীতারাকে বাইরে এনে কৃত্তিবাস দরজার শিকল তুলে দিলে।

গোবর্ধন বললে, রতনা ব্যাটা পালালো কোথা? বড় আজ ফস্কে গেল। তার মাথাটা যদি আজ দুফাঁক করতে পারতুম?

আকস্মিকতা অভিভূত করেছিল শশীতারাকে।

গোবর্ধনের নির্দেশ মতো কৃত্তিবাস শশীতারাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। থানায় জনপ্রাণী ছিলো না বড়বাবু আর রতন ছাড়া। বড়বাবু সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছিলেন।

থানার সামনে বিরাট একটা বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন অপেক্ষা করে রইল রতনের জন্য।

তেরো

কৃত্তিবাস আর শশীতারার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে

গোবর্ধন গ্রেপ্তার হয়েছে নরহত্যা ঘটানোর চেষ্টা করবার অভিযোগে।

সংবাদ শুনে বঙ্কিম চমকে উঠলো। শশীতারার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে ? সে থানার বড়দারোগাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল ? তার সহযোগী ছিলো কৃত্তিবাস আর গোবর্ধন !

সিগারেটের পর সিগারেট জ্বালিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করতে করতে বঙ্কিম ভাবতে লাগলো আকাশ-পাতাল। শশীতারা চেষ্টা করবে নরহত্যা করবার ? কথাটা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, অসম্ভব ! বিস্ময়ের অকূল সমুদ্রে সে যেন দিকচিহ্ন হারিয়ে ফেললে। একটিন সিগারেট শেষ করেও সে সমস্যার জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে পারলে না।

শশীতারা আর কৃত্তিবাস নিরুদ্দেশ। গোবর্ধন গ্রেপ্তার হয়েছে থানার সামনে। রতন জমাদার প্রত্যক্ষদর্শী। অল্পের জন্য সে বেঁচে গেছে। ভালমতো পালাতে না পারলে বড়দারোগার মতো তাকেও হাসপাতালে যেতে হত। গোবর্ধন, কৃত্তিবাস আর শশীতারাকে উন্মাদের মতো লাঠি হাতে ছুটে আসতে দেখেই সে সরে পড়েছিল।

শশীতারার লাঠি হাতে করে ছুটে আসবার কথাটা বঙ্কিম কল্পনা করবার চেষ্টা করছিল।

রতন নিশ্চয় সত্য গোপন করেছে। কিন্তু সত্য কথাটা কি ? এই প্রশ্ন বঙ্কিমকে অতিষ্ঠ করে তুললে। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে সে ছুটলো হাসপাতালে। কৌতূহল আর উদ্বেগ এই দুইয়ের মাঝখানে তার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

স্প্রিং-এর খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়েছিলেন গোপালনগর থানার

ও সি সতীশ মিত্তির। মাথায় তাঁর পুরু করে এক প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মুখ বিবর্ণ। চোখের নীচে কালি পড়ে মুখখানাকে করে তুলেছে অস্বাভাবিক।

সন্তর্পনে তাঁর বিছানার পাশে বসে বঙ্কিম বললে, মাফ করবেন মিষ্টার মিটার। আসল ব্যাপারটা কি বলুন তো? গোবর্ধন বা কৃত্তিবাসের দ্বারা সব কিছু করা সম্ভব একথা মেনে নিলেও শশীতারার মানুষ খুন করবার ক্ষমতা আছে সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। সত্যিকথা আমায় খুলে বলতে হবে।

তার কৌতূহল এতই অদম্য হয়ে উঠেছিল যে আহত ব্যক্তির কুশল সংবাদ নেওয়ার যে সাধারণ শিষ্টাচার সম্মত রীতি প্রচলিত আছে সেই কথাও সে ভুলে গেল।

—যা শুনেছেন তাই সত্যি।—ক্ষীণকণ্ঠে সতীশ মিত্তির বললেন।

—কখনো না! হয় আপনি জানেন না, নয়তো মিথ্যা বলছেন।—বঙ্কিমের কণ্ঠস্বর দৃঢ় হয়ে উঠলো।

সতীশ মিত্তিরের ক্ষীণ কণ্ঠ কঠিন হয়ে উঠলো, আপনার এ ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন?

বঙ্কিম একমিনিট ইতস্তত করলে। তারপর বললে, কেন শুনবেন? আমি শশীতারাকে ভালোবাসি।

সতীশ মিত্তিরের মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। বাঁকা হাসি হেসে তিনি বললেন, কথাটা আমরা বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে জনরব যা শোনা যেত তা মিথ্যা নয়।

—সম্পূর্ণ সত্যিও নয়।—বঙ্কিম বললে, কালাচাঁদ জ্যেঠা আর তাঁর দলবল প্রচার করে বেড়াতেন যে শশীতারার সঙ্গে আমার অবৈধ প্রণয় আছে। সে কথাটা একেবারেই মিথ্যা।

—কোন অবৈধ কাজ করে সে কথা স্বীকার করা চলে না বঙ্কিমবাবু

—সতীশ মিত্তিরের কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো শ্লেষ, অবৈধ কাজ করার স্বীকৃতি আইনের চোখে অপরাধ।

—অবৈধ কাজের অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে আপনার অনেক বেশী।—বঙ্কিম মৃদু হেসে বললে, যাই হোক এ তর্ক তোলা রইল। এখন আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

—দিয়েছি তো।

—না দেননি।—বঙ্কিমের কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে উঠলো। সে বললে, শশীতারা মানুষ খুন করতে যাবে সে কথাআমার বিশ্বাস হয় না। সত্যি না বললে আমি ছাড়ব না মিষ্টার মিটার। এই ঘটনার মূল আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি আমাকে শত্রু হিসাবে পেতে চাইবেন না। চাইলে আপনারই ক্ষতি। সুতরাং আমাকে সত্যি কথা বলুন।

গোপালনগর থানার বড়দারোগার কড়া লোক বলে খ্যাতি ছিলো। কিন্তু হঠাৎ তিনি নরম হযে গেলেন। বললেন, একেবারে শত্রু হয়ে উঠতে চাইছেন যে? ব্যাপার কি?

—বলেছি তো, শশীতারাকে আমি ভালোবাসি। তার জন্য আমি বহুদূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত। যদি প্রয়োজন বুঝি মেজর হোয়াইটের সাহায্যও আাম নোব। সেই ক'হাজার গ্যালন পেট্রোল চুরির, আর....

—চুপ! চুপ!—সতীশ মিত্তির নিজের হাতদিয়ে বঙ্কিমের মুখ চেপে ধরলেন। বললেন, বঙ্কিমবাবু, আপনি আাম সকলেই আমরা অন্যায় করে থাকি।

—অন্তত আমি তো করি!—বঙ্কিম বললে, মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিয়ে আর ব্ল্যাকমার্কেটিং করে বড়লোক হয়েছি আর অন্যায় করি না? তবে আমি অসৎ হলেও অপরকে বিপন্ন করবার জন্য অসত্যের সাহায্য নিতে দ্বিধা করি। নিজের সম্পর্কে কোন অন্যায় করতেই আমার বাধে না,

কিন্তু সে অন্যায়ের সীমারেখাও আছে। সেই সীমার বাইরে পা দিতে আমার আপত্তি যথেষ্ট।

সতীশ মিত্তিরের কণ্ঠস্বরে এবার প্রকাশ পেলে কাকুতি। তিনি বললেন, অল্পবিস্তর অন্যায় আমরা সকলেই করে থাকি একথা যদি অস্বীকার না করেন তাহলে সহজেই আমায় ক্ষমা করতে পারবেন। কিন্তু তার আগে আমার একটি কথার উত্তর দিতে হবে। শশীতারাকে আপনি ভালোবাসেন সে কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু সে কি রকম ভালোবাসা ?

—ভালোবাসার রকমফের আছে কিনা জানিনা, তবে আমি যে তাকে সত্যসত্যই ভালবাসি সে কথা আবিষ্কার করেছি সে নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে। এটেম্পট্ টু মার্ডার এই অভিযোগ তার নামে এসেছে, আর সে নিরুদ্দেশ হয়েছে শুনে আমার বুকের ভিতর যেন তোলপাড় করে উঠলো। আমি পিছন ফিরে যেন অতীতকে উপলব্ধি করতে পারলুম। আমাদের পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতার সমগ্র ইতিহাস আমার কাছে হয়ে উঠলো অর্থময়। এক নিমেষের মধ্যে তাকে যেন আমি দেখতে পেলুম। দেখতে পেলুম তার অন্তরকে। সে খুন করবার চেষ্টা করবে সে কথা আমার অসম্ভব মনে হল। আমার এই বিশ্বাস এমনই দৃঢ় হয়ে উঠলো যে শেষে হাসপাতালে এসে আপনাকে অসুস্থ অবস্থাতেও বিরক্ত করতে দ্বিধা করলুম না।

নিবিষ্ট চিত্তে সতীশ মিত্তির শুনছিলেন বঙ্কিমের কথা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি আপনাকে ভালোবাসে ?

—না। তার স্বামী হৃষিকেশের স্মৃতি তার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

—কি করে জানলেন ?

—আমি জানি।

—আশ্চর্য !—সতীশ মিত্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

—এখন আপনি বলুন মিষ্টার মিটার!—বঙ্কিমের কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেলে অধীরতা।

তার অস্থিরতার দিকে লক্ষ না করে সতীশ মিত্তির বললেন, পুলিশের কাজ করে করে জেরা করাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দাঁড়ান আগে সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হই। শশীতারাকে আপনি একবার অপমান করেছিলেন না? সে জন্য দাসপাড়ার মাহিষ্যেরা ক্ষেপে গিছল? কালো বাবুর কছে থেকেই আমি বোধ হয় খবরটা পেয়েছিলুম।

—হ্যাঁ করেছিলুম।—শান্ত কণ্ঠে বঙ্কিম বললে।

সতীশ মিত্তির বাঁকা হাসি হাসলেন আবার। বললেন, তাহলে শুনুন। আমিও তাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছিলুম। সেই সময় কৃত্তিবাস আর গোবর্ধন এসে আমায় আহত করে। এ বিষয়ে আপনি আমায় দোষ দিতে পারবেন না বঙ্কিমবাবু! কারণ আমরা উভয়েই সম-শ্রেণীর অপরাধী, আর অপরাধ অনুষ্ঠানের হেতুও এক অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়না আর কি?—সতীশ মিত্তির এবার নির্লজ্জের মতো হেসে উঠলেন হা হা করে।

বঙ্কিমের চোখদুটো একবার জ্বলে উঠলো। সতীশ মিত্তিরের কুৎসিত হাসি যেন তার গায়ে বিঁধতে লাগলো স্থচের মতো। ঘৃণায় রি রি করছিল তার অন্তর। সেকি ওইজন্যই শশীতারাকে অপমান করেছিল? তার প্রবৃত্তি, কি এতই জঘন্য? তার ইচ্ছা হল, সে সতীশ মিত্তিরের কথার প্রবল প্রতিবাদ করে। তাকে বলে, হৃষিকেশের স্মৃতিতে তন্ময় হয়ে শশীতারার সেই গান গাওয়ার কথা। মৃত হৃষিকেশের সেই 'মমী'টার কথা। যে 'মমী'টার প্রতি তার ঈর্ষার সীমা নেই।

প্রবৃত্তির তাড়নায় সে শশীতারাকে অপমান করেনি সেই কথাটা সতীশ মিত্তিরের ঘাড় ধরে গোটাকতক ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তার আগ্রহ হয়ে উঠলো অসীম।

কিন্তু বঙ্কিম আত্মসংবরণ করলে। এসব কথা যে মানুষকে জোর করে বোঝান যায় না সেকথা বোঝবার মতো বুদ্ধি তার আছে।

একটা বড়ো রকমের জয়লাভ করে সতীশ মিত্তির যেন এতক্ষণ বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তিনি বললেন, আমার ওপর রাগ করলেন না তো?

সতীশ মিত্তিরের কথার কঠিন উত্তর দেওয়ার শক্তি বঙ্কিমের ছিলো। তার উদ্ধত প্রকৃতির সামনে এতদিন সকলকেই নীচু হতে হয়েছে কিন্তু আজ তার ঔদ্ধত্যের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। আস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, না রাগ করিনি। শশীতারা মানুষ খুন করতে পারে না জেনে সান্ত্বনা পেয়েছি।

সে আর দাঁড়ালো না। তার উঁচু মাথা আজ প্রথম নীচু হয়েছে। সে আজ প্রথম উপলব্ধি করলে যে, গোপালনগরের প্রত্যেকটি লোক জানে যে প্রবৃত্তির তাড়নায় সে শশীতারার ওপর অত্যাচার করতে গিছল। তার অন্তরে জেগে উঠলো হীনতাবোধ।

নিজের চোখে নিজের অপরাধ অমার্জনীয় বলে মনে হতে লাগলো।

মির্জাপুরের মেসবাড়ীতে একটি ঘরের কোণে চুপ করে বসেছিল শশীতারা। অনবগুণ্ঠিতা রজনীগন্ধার মতো তার পূর্ণ বিকশিত যৌবনশ্রী ঘিরে নেমেছে যেন নিরানন্দ অবসাদ। মুখে তার বিষাদের ছায়া। চোখে দুর্বোধ্য আতঙ্ক।

সেই রাত্রির সেই ঘটনার পর থেকে মানসিক স্বচ্ছন্দতা সে হারিয়ে ফেলেছে। সে ভাবছে অনেক কিছু। সেই ভাবনার মধ্যে না আছে শৃঙ্খলা না আছে সঙ্গতি।

দুঃখবোধ আজ তার অনুভূতির জগতে পরিব্যাপ্ত। দুঃখে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।

জীবনের চলস্রোতে হাল্কা হাওয়ায় পাল তুলে যে নৌকাখানা পাড়ি দিচ্ছিল হঠাৎ তার সামনে ঘূর্ণী দেখা দিলে কেন?

শশীতারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না। কিন্তু তার কাছে আজ বঙ্কিম আর সতীশ মিত্তির দুজনেরই সমান মূল্য। তাদের আচরণের অর্থ সে বুঝতে পারে।

পশু দুটো তাকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে গেছে। দিন দুপুরে বঙ্কিমের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আর থানায় সতীশ মিত্তিরের কবলে পড়ে সে যেন সমগ্র পুরুষ জাতেরই পরিচয় পেয়ে গেছে। এই পরিচয় পাওয়ার পরেও যে আবার তাকে পুরুষের সম্পর্কে আসতে হল সেই চিন্তা তাকে পীড়িত করছে অহরহ।

তাকে আশ্রয় দিয়েছে গৌরীকান্ত। পৃথিবীনাথও এখানে আছে। কিন্তু তাদের দুজনের মনের চেহারা কেমন তার আভাস সে এখনো পায়নি। কোন মুহূর্তে, কিসের প্ররোচনায় তাদের মুখোস পড়বে খসে, ঘৃণিত আর বীভৎস নগ্নরূপ বেরিয়ে আসবে সীমাহীন বর্বরতা নিয়ে, নির্লজ্জ কামনাকে বাহন করে তার কোন ঠিক নেই।

সেই জন্যই জীবনের সমাপ্তির কথা সে চিন্তা করছে। অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক সমাপ্তি! তিক্ত আর বিস্বাদ হয়ে উঠেছে পৃথিবী। জীবনের প্রতি আকর্ষণ গেছে লুপ্ত হয়ে।

কিছুদিন আগেও তার জগত ছিলো রঙীন। কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধ না হলেও এই পৃথিবীর আলো ও হাওয়া সে করত উপভোগ। ফুলে আর ফলে, শোভায় আর সৌন্দর্যে তার পৃথিবী ছিলো মনোহর। জীবনের প্রতি আকর্ষণও ছিলো অপরিসীম। বৈধব্য এ পর্যন্ত তার কাছে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠেনি। শুধু হৃষিকেশের স্মৃতি-মধুর একটি সৌরভ

আচ্ছন্ন করে থাকত মন। কদাচিৎ বিচ্ছেদের অসহ্য বেদনায় সে অধীর হয়ে পড়ত। তার সেই অধীরতা প্রশমিত হ'ত হৃষিকেশের গানে।

কিন্তু আজ সে অনুভব করছে বৈধব্য যন্ত্রনা কি ভয়ানক। বিধাতাকে সে অভিশাপ দিচ্ছে তার জ্বালাময় মনের নির্জন থেকে। একজনের মৃত্যু আর একজনের জীবনকে এমন করে বিপর্যস্ত করে দিলে কেন? কেন জীবনের আনন্দ ও সান্ত্বনা থেকে তাকে এমন নির্মমভাবে বঞ্চিত করা হল? কি দোষ তার?

কোন পাপ, কোন অন্যায় বা কোন অপরাধই তো সে করেনি!

তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। অন্তরে জাগছে প্রতিশোধ স্পৃহা। মনে মনে সে বারংবার উচ্চারণ করছে, বিধাতার মাথায় বজ্রাঘাত হোক।

তার অস্বচ্ছ দৃষ্টি কোন কিছুই সহজ ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারছে না। ভবিষ্যতের অনন্তবিস্তৃত পথে কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে ধূসর কুয়াশার আস্তরণ। সেই কুয়াশায় দিক নির্ণয় করতে সে অক্ষম। কুটিল ও কদর্য বর্তমান তাকে করে তুলেছে হতাশ ও বিভ্রান্ত।

সমুদ্র মন্থনের সমস্ত হলাহল সঞ্চিত হয়েছে তার দৃষ্টি কোণে। দৃষ্টিপাতে বিন্দু বিন্দু বিষ ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বে।

মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক এরোপ্লেন উড়ে গেল গম্ভীর গুঞ্জন করে। কবি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, ওই শোন, ওরাই আমাদের বাঁচাবে বিদেশীর আক্রমণ থেকে। সমুদ্র পার হয়ে ওরা এল আমাদের রক্ষা করতে। আত্মরক্ষা করবার অধিকারও আমাদের নেই।

—কেন নেই?—শশীতারা বললে।

—থাকলে গোপালনগর থানার দারোগা তোমার উপর অত্যাচার করতে সাহস করত না। বুঝলে?

—না। বুঝতে পারলুম না।

—আরো ভালো করে বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে দিনরাত ধরে ওরকম আকাশ-পাতাল না ভেবে শক্তি সঞ্চয় করো।—কবি বললে।

শশীতারা ম্লান হাসি হাসলে।

কবি বললে, হেসো না। দেহের এবং মনের শক্তি মানুষের পরম প্রয়োজন। দুর্গতি আর দুর্দশা থেকে শক্তিই মানুষকে পরিত্রাণ করে।

—বাজে কথা।—শশীতারা বললে, দুর্গতি আর দুর্দশা থেকে মানুষের নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

কবি হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, তুমি তো এতখানি নৈরাশ্যবাদী ছিলে না? তুমুল বৃষ্টির মধ্যে তোমার হাত ধরে ডোবা পার হয়ে, জলা ভেঙে যেদিন পালিয়ে এসেছিলুম সেদিন তোমার সম্বন্ধে বিপরীত ধারণাই আমার হয়েছিল। তোমার দুঃসাহসকে আমি অভিনন্দিত করেছিলুম। তোমার মানসিক শক্তি আমাকে বিস্মিত করেছিল। তোমার মধ্যে সেই দুঃসাহস আর শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ আমি দেখতে চাই। তার অনুশীলন তোমাকে করতে হবে।

শশীতারা কেঁদে ফেললে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, আমার মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাবো।

—কেঁদো না।—শান্ত কণ্ঠে কবি বললে, দুর্দৈবের কথা তুমি ভুলতে পারছ না সে কথা আমি জানি। লাঞ্ছনার স্মৃতি তোমায় অতিষ্ঠ করে তুলছে। তোমার বিশ্বাস পড়ছে ভেঙে। সংস্কার হয়ে যাচ্ছে চূর্ণ। তবু তোমায় উঠে দাঁড়াতে হবে শশীতারা! প্রতিক্রিয়ার অবসাদকে জয় করতেই হবে।

—কোন কিছুতেই আমার আর বিশ্বাস নেই।—ক্ষীণ কণ্ঠে শশীতারা বললে।

—কিন্তু বিশ্বাসই জীবনধারণের মূলমন্ত্র। বিশ্বাস হারালে মানুষের আর কোন সম্বলই থাকে না।

—কাকে বিশ্বাস করব বলুন?—শশীতারার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, আমি ভগবানের ওপর, মানুষের ওপর এমন কি নিজের ওপরেও বিশ্বাস হারিয়েছি।

—ভগবানের ওপর বিশ্বাস হারালে অবশ্য ক্ষতি নেই। তাঁকে বিশ্বাস করা আর না করা দুইই সমান। তবে মানুষের ওপর আর নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না।

—মানুষের ওপর আর কি করে বিশ্বাস থাকবে?

—যেমন করে আগে ছিলো। সকলেই তো আর থানার বড়ো দারোগা নয়?

—আমার মনে হয় সকলেই। পুরুষ মাত্রেই পশু।

—মেনে নিলুম।—কবি বললে, কিন্তু সব পশুই হিংস্র নয়। তাদের মধ্যেও বিশ্বাসযোগ্য কেউ কেউ থাকতে পারে।

শশীতারা স্তব্ধ হয়ে রইল।

গম্ভীর হয়ে কবি বললে, দেখ, জীবনধারণের প্রয়োজন যেমন আছে তেমনি জীবনধারণের পদ্ধতিও আছে। মরে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। যদি বাঁচতেই হয় সতেজে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করো। অতীত নিয়ে বিলাপ না করে চেয়ে দেখ ভবিষ্যতের দিকে।

কবির কথাগুলো দুর্বোধ্য। শশীতারা তার অর্থগ্রহণ করতে পারছিল না। কিন্তু তার অন্তরে অনুরণিত হতে লাগলো সান্ত্বনার সুর। বেদনাব্যথিত চিত্তে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো আশার মৃদু সঙ্গীত। কবির দিকে সে চেয়ে দেখলে। দীপ্ত একটি অগ্নিশিখার মতো দেহ তার উন্নত হয়ে আছে অপরূপ এক ভঙ্গীমায়। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি একাগ্র ও স্থির। মুখে একসঙ্গে ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় কমনীয়তা আর অসঙ্কোচ দৃঢ়তা

শশীতারার চোখের সামনে থেকে যেন ঘনান্ধকার অপসারিত হয়ে যাচ্ছিল। আকাশের পূর্বপ্রান্ত রঞ্জিত করে যেন আরক্তিম সূর্য আত্মপ্রকাশ করছে সমুজ্জল সম্ভাবনা নিয়ে। সে মনে মনে প্রণাম করলে এই দীপ্ত সূর্যোদয়কে। কাতর কণ্ঠে কবিকে বললে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে কি করতে হবে বলে দিন? বলুন, কোন কাজে আমি লাগব?

—সব চেয়ে মহৎ কাজে।—গভীর কণ্ঠে কবি বললে, তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পারবে? পারবে আমায় বিশ্বাস করতে?

—পারব।—শশীতারা বললে।

—আমিও হয়তো পশু।—কবি বলতে লাগলো, কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি যে সব পশুই হিংস্র নয়। আমিও তোমায় দেখেছি। তোমার কমনীয় দেহের দীপ্ত যৌবন আমাকেও আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি আর থানার বড়ো দারোগার দৃষ্টি এক নয়। তোমার সৌন্দর্য আমাকে আনন্দ দেয় কিন্তু প্রলুব্ধ করে না। মনের সঙ্গে মনের সংযোগের আনন্দ আমি আস্বাদন করতে পারি তাই দেহের জন্য প্রলুব্ধ হওয়ার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই। আমি জীবনরসের রসিক। স্বচ্ছন্দে ছুটে যাই ধ্বংসাস্তীর্ণ শ্মশানের দিকে। যেখানে নতুন সৃষ্টির বীজ হবে অঙ্কুরিত। লালা-বিলাসের অবসর আমার নেই। তবু একথাও আমি অস্বীকার করব না যে তোমার সংস্পর্শে এসে আমি পাবো আনন্দ। তোমার সংসর্গে আমার মন হবে শিহরিত। তোমার সমর্থন আমাকে উৎসাহিত করবে দ্বিগুণ তেজে পদক্ষেপ করতে।

কবির কথার মধ্যে কি যেন মাদকতা আছে। শশীতারার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

কবি বলে চললো আপন মনে, কই, কৃত্তিবাস তো ভেঙে পড়েনি? ঘটনাকে সহজ ভাবে নিতে না পারলেও সেই নিয়ে কোনরকম বাড়াবাড়িও সে করে না। যে জীবনকে সে পরিত্যাগ করে এল তার

জন্ত তার মনে কোন আক্ষেপ নেই। গৌরীকান্ত জুটমিলে তাকে যে কাজে লাগিয়েছে সেই কাজ সে করছে আগ্রহের সঙ্গে। এখন ত তাকে দেখে মনে হয় একমাত্র আত্মগোপন করবার দুশ্চিন্তা ছাড়া তার মনে আর কোন উদ্বেগ নেই। তুমি তবে কেন এত ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছ শশীতারা ?

—বাবার স্বভাবই ওইরকম। কিছুই মনে থাকে না।—শশীতারা বললে, কিন্তু আমার ভয় হয় বাবা লুকিয়ে থাকতে পারবে তো ? মিলে কাজ নিলে কি না তাই বলছি।

—মিলে কাজ নিয়েই লুকিযে থাকা সহজ। কবি বললে, আত্মগোপন করা তখনি সার্থক হয যখন সে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে। ঘরে খিল দিয়ে লুকিয়ে থাকার মতো বিড়ম্বনা আর নেই শশীতারা !

—আমার ভয় করে।

—ভয় !—কবি গর্জন করে উঠলো, ভয় কি জন্য ?—তোমার বাবা খুব বেশীদিন লুকিয়ে থাকবার অবসর পাবে না। এমন দিন আসছে যেদিন সহস্র লোকের সঙ্গে তাকে অগ্রসর হতে হবে। সেই চরম বোঝাপড়ার দিনে কারোরই লুকিয়ে থাকা চলবে না। ভয়ে আমরা কেউ আত্মগোপন করে নেই। দুর্বার প্রকাশের প্রত্যাশায় আমরা প্রহর গুনছি। সেদিন যখন আসবে তখন কেউ আমাদের বন্ধ করে রাখতে পারবে না। তাইত বলছিলুম, তুমি লাগবে সবচেয়ে মহৎ কাজে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শশীতারা বললে, বলুন সে কি কাজ ?

—চরম বোঝাপড়ার দিনটিকে এগিয়ে নিয়ে আসার কাজ।—কবি বললে, আমরা যাবো বোম্বায়ে। সেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। সেই অধিবেশনে রচিত হবে ভারতবর্ষের আগামী পদক্ষেপের মহিমাময় ইতিহাসের ভূমিকা। সেই ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করব তুমি আর আমি। কোটী কোটী জনসাধারণের সুষুপ্ত আকাঙ্ক্ষা মহাজাগরণের বন্যায় হয়ে

উঠবে উজ্জ্বল। কেউ তাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। কোন শক্তি পারবে না দলিত করতে। নেতৃত্বের আসন থেকে নির্দেশ আর উপদেশ দিয়ে তাকে আর দাবিয়ে রাখা চলবে না। প্রস্তুত হও শশীতারা, আর ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়, হতাশা নয়। নতুন জীবনের আহ্বান হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কবি উঠে দাঁড়ালো। তার দীর্ঘ ও উন্নত দেহের দিকে চেয়ে হঠাৎ শশীতারা উঠলো চমকে। এ কে তার সামনে দাঁড়িয়ে? এ যে হৃষিকেশ! তেমনি আবেগময় দৃষ্টি আর প্রদীপ্ত দেহ নিয়ে সে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেকি সত্যসত্যই পাগল হয়ে গেল?

কবি তখন আবৃত্তি করছিল দৃপ্ত কণ্ঠে:

"চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি॥"

শশীতারা বসে রইল অর্ধমূর্চ্ছিতের মতো স্তম্ভিত চিত্তে।

আকাশ ঘনান্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের শাণিত দীপ্তি উঠছে চমকে। প্রকৃতি স্তব্ধ কিন্তু শান্ত নয় শঙ্কিত। আসন্ন প্রলয় সম্ভাবনায় ত্রাসত্রস্ত সৃষ্টি যেন শিহরিত হয়ে উঠছে। কোথাও কোন

সাড়া নেই, শব্দ নেই। শুধু মেলট্রেনখানা ছুটে চলেছে গর্জন করতে করতে জব্বলপুরের পথে।

আরোহীদের চোখে নিদ্রার জড়িমা। কখনো তারা ঝিমুচ্ছে আবার কখনো বসছে সোজা হয়ে। তাদের দৃষ্টিতেও উদ্বেগ আর আশঙ্কা। প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদের মনকে করেছে প্রভাবিত।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের চোখে ঝলমল করে উঠছে বিদ্যুতের স্বপ্ন। নিবিড় রাত্রির কালিমার ভিতর দিয়ে সে পদক্ষেপ করছে বুকে নির্যাতন আর লাঞ্ছনার ক্ষত নিয়ে।

অবিচলিত, অকুণ্ঠিত ও দৃঢ় পদক্ষেপ।

অত্যাচারকে গ্রাহ্য না করে, ভয়কে উপেক্ষা করে, লোভকে পরাজিত করে সে হচ্ছে অগ্রসর। আদর্শবাদের বলিষ্ঠ রূপরেখা চোখের সামনে হয়ে উঠছে উজ্জ্বল। ছিদ্রহীন অন্ধকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে, যে অন্ধকারকে সে অস্বীকার করে এসেছে সৃষ্টির ঊষা থেকে। শক, হূণ, পাঠান, মুঘল, ইংরেজ যে অন্ধকারের যবনিকা বারংবার তার চোখের সামনে দিয়েছে টেনে।

কিন্তু সে অন্ধকার পরাজিত হয়েছে পুনঃপুনঃ তার আত্মার আলোকে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

নিঃঝুম প্রকৃতির দিকে চেয়ে কবির উদ্বেল চিত্তে জেগে উঠলো আলোড়ন। তার মাথার তুর্কী ফেজ টুপী উঠলো দুলে। পরণের কোর্তা আর পায়জামার ভিতরে সারা দেহটা হয়ে উঠলো চঞ্চল।

তার একপাশে বসে খাকী সার্ট আর সর্টপরা উদ্ধতদৃষ্টি একজন পুলিস ইনস্পেক্টর। নিবিষ্ট চিত্তে সে বসে বসে সিগারেট টানছে। কোনদিকে তার লক্ষও নেই।

আর এক পাশে পাঞ্জাবী আর পায়জামা পরা শাস্ত্রীরা। তার

মাথার ওড়না ললাট পর্যন্ত টানা। চলন্ত ট্রেনের গতিবেগে বায়ুভরে সেই ওড়না কাঁধে খসে পড়ছে বারবার।

পাঞ্জাবী তরুণীর বেশে বসে আছে শশীতারা। তার অতুলনীয় রূপ ট্রেনের কামরার মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিস্ময়ের।

তারও কোন দিকে লক্ষ নেই।

বিশাল চোখের মদির কটাক্ষ তেমনি সজীব। অসংযত ও উদ্দাম যৌবন তেমনি আকর্ষণময়। তবু সে নির্বিকার, নিশ্চিন্ত ও স্তব্ধ।

মধুর দিবাস্বপ্নের রেশ শেষরাত্রির নিদ্রার মতো তার চোখে রয়েছে জড়িয়ে। বার বার সে কবির দিকে দেখছে চেয়ে। যদি হৃষিকেশকে দেখতে পায়।

কবির চোখে অনির্বাণ জ্বালা। সেই জ্বালাভরা চোখ নিয়েও তার সতর্কতার সীমা নেই। পাশের পুলিশ ইনস্পেক্টরটি আভাষে-ইঙ্গিতেও যেন কিছু বুঝতে না পারে। দুটি ফেরারী আসামী তার পাশে পর পর বসে আছে!

শশীতারার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

সেই বোম্বাই মেলেরই প্রথম শ্রেণীর একখানি কামরায় গদি আঁটা আসনে হেলান দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে বঙ্কিম। কিন্তু ঘুম আসছে না। শ্বেতাঙ্গ মিলিটারী অফিসারে কামরাটা ভর্তি। তাদের মধ্যে সেই একমাত্র ভারতীয়।

বঙ্কিম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। গোপালনগরের মতো ট্রেনের কামরাও তার ভালো লাগছে না। একটা হীনতাবোধ তাকে পীড়িত করছে অহরহ। সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে সে শশীতারার চোখে আর গোপালনগরের প্রত্যেকটি মানুষের চোখে অনেকদূর নীচে নেমে গেছে। এমন কি সতীশ মিত্তিরও তাকে তার সমশ্রেণীর পশু বলে মনে করে!

কাল্পনিক আত্মাভিমানকে সে জয় করবার চেষ্টা করছে অনেকে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টের প্রলোভন দেখিয়ে।

বোম্বাই মেল ছুটছে জব্বলপুরের পথে। অন্ধকারের সমুদ্রে এক একটা ষ্টেশন জেগে উঠছে দ্বীপের মতো।

বিক্ষোভ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বিখ্যাত আগষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। দেশনায়করা হয়েছেন বন্দী। গান্ধীজী শেষ মুহূর্তেও লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে একটা সম্মানজনক মীমাংসার পথে আসবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করা হয়নি।

গভর্ণমেণ্ট যেন এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই ছিলো। লাঠি, বন্দুক আর বেয়নেট দিয়ে প্রতিরোধ করা হ'ল স্বাধীনতার অভিযানকে।

জনসাধারণ অদম্য। নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তারা দুর্বার হয়ে উঠলো। গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হয়ে এসে তাদের আক্রমণ করবে আর সেই আক্রমণের সম্মুখে তারা মরবে অসহায় পশুর মতো সে তারা সহ্য করতে পারলে না। সদ্যজাগ্রত আত্মসম্মানবোধ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"

অটল শৈলশিখরও টলে উঠলো সেই কণ্ঠস্বরে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম সর্বত্র দেখা দিলে বিদ্রোহ। স্বতস্ফূর্ত বিপ্লবে চঞ্চল হয়ে উঠলো আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ।

লাঠি, বন্দুক আর বেয়নেট জনসাধারণ গ্রাহ্য করলে না। তাদের ওপর চলতে লাগলো মেশিনগান। এরোপ্লেন বোমাবর্ষণ করলে আকাশ থেকে। অভিযাত্রী জাপানী সৈনিকদের প্রতিরোধ করবার জন্য যে এরোপ্লেনগুলি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। দেশরক্ষার দায়িত্ব যারা নিয়েছিল তারা দেশবাসীদের হত্যা করলে নির্বিচারে।

শুধু তাই নয়, শান্ত জনপদ তারা লুণ্ঠন করলো। স্ত্রীলোকদের করলে ধর্ষণ। আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিলে গ্রামের পর গ্রাম।

ক্ষিপ্ত জনসাধারণ রেল লাইন তুলে ফেললে। বড়ো বড়ো গাছ কেটে, রাস্তা ভেঙে, সাঁকো চূর্ণ করে মহাযুদ্ধের সরবরাহ ব্যবস্থা করে দিলে বিপর্যস্ত। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল বহু স্থানে।

সাহসী ইংরেজ সৈন্য অনেক জায়গা থেকে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করলে।

সভ্যতাভিমানী ইংরেজের উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় মুখোস খসে পড়ল। অন্তরের নির্জন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল হিংস্র পশু নখ দাঁত আর উদ্যত থাবা নিয়ে। বিবেক, বিচার-বুদ্ধি, বিবেচনা সব গেল লুপ্ত হয়ে।

বিপ্লববাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠলো। যারা বন্দী হয়েছিল কারাগার আর তাদের আবদ্ধ করে রাখতে পারলে না। অবরোধ ভেঙে তারা পড়ল বেরিয়ে। বৃহৎ জীবনের আহ্বানে তাদের আদর্শবাদ অভিনব অনুপ্রেরণায় হয়ে উঠলো বলিষ্ঠ। নেতৃত্বহীন দেশকে তারাই দিলে পথের নির্দেশ।

দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত আলোড়িত হয়ে উঠতে লাগলো।

সেই আলোড়ন গোপালনগরকেও স্পর্শ করলে।

বিদ্রোহ প্রথম দেখা দিয়েছিল মহকুমা সহরে বিক্ষোভের আকারে। পুলিশ সেই বিক্ষোভ দমন করতে কৃতকার্য হল না। থানা, রেজিষ্টারী অফিস, আদালত আগুনে গেল পুড়ে। সৈন্যদল আহ্বান করা হল। গ্রামের অভ্যন্তর থেকে বিশ্রাম-শিবির পরিত্যাগ করে সশস্ত্র সৈনিকেরা এল কুচকাওয়াজ করতে করতে। ওদিকে গ্রামের ভিতরে তাদের শিবিরে শিবিরে জ্বলে উঠলো আগুন। টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটোতে লাগলো। পোষ্টগুলিকে উপড়ে ফেলা হল। কয়েকজন সৈনিকও হল নিহত।

যোগাযোগ ব্যবস্থাও হয়ে গেল বিপর্যস্ত। মহকুমা সহর থেকে কয়েক মাইল রেললাইনের অস্তিত্ব রইল না। পায়ে-চলা পথগুলিকে অব্যবহার্য করে ফেলা হল। সাঁকোগুলি হল চূর্ণবিচূর্ণ। কাটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী হল কৃত্রিম প্রাচীর।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি তখন সঙ্কটাপন্ন। বঙ্গোপসাগরে ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব বিলুপ্তপ্রায়। ইচ্ছা থাকা সত্বেও ইংরেজ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তির সমাবেশ করতে পারলে না।

গোপালনগর ও তার আশপাশের গ্রামগুলিতে পুলিশ থানার কোন অস্তিত্ব রইল না। থানার কর্মচারীদের অনেকে হল বন্দী। উত্তেজিত বিদ্রোহীরা তাদের কাকেও কাকেও হত্যাও করলে। যে সমস্ত গ্রামবাসী জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলে না তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হতে লাগলো। কেউ কেউ নজরবন্দী হয়েও রইল।

জাতীয় সরকার পঞ্চায়েতী শাসন প্রবর্তন করলে। স্বতন্ত্র থানা ও আদালত তারা তৈরী করলে। শাসনব্যবস্থার সব কিছুই তারা তুললে গড়ে।

কৃষকদের জীবনে দেখা দিলে এক বিচিত্র পরিবর্তন।

মাঠ, ঘাট বর্ষার জলে পরিপূর্ণ। সেই জলের ওপরে ধানগাছগুলির মাথা জাগিয়ে থাকা তারা দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই অভ্যস্ত দৃশ্য তারা এবার দেখতে পায়নি। তবুও তাদের ক্ষোভ কিছু পরিমাণে প্রশমিত হল। সেই ফুটিফাটা অকর্ষিত মাটি তাদের দৃষ্টিপথে আর পড়ে না। সৈন্য শিবিরের ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে জলে ভাসমান অবস্থায় দেখা যায়। তাঁবুর ভাঙা কাঠ এনে তারা জ্বালানি করছে। ক্যানভাসগুলিও কাজে লাগিয়েছে। সৈনিকদের প্রতি যে বিদ্বেষ এতদিন অবরুদ্ধ হয়েছিল তার উন্মাদ প্রকাশ তাদের কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করেছে

স্বাধীনতার আস্বাদে তারা হয়ে উঠলো সজীব।

তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল কৃষ্ণা আর গৌরীকান্ত।

কৃষ্ণা আত্মপ্রকাশ করেছিল উপযুক্ত মুহূর্তে। গৌরীকান্ত কলকাতা থেকে এসেছিল চলে। শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে তার প্রাণপাত পরিশ্রম করে কাজ করা ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতকতায় এই ঐতিহাসিক বিপ্লবে শ্রমিকেরা পিছনে পড়ে রইল।

বিকাশের নির্দেশে গৌরীকান্ত শ্রমিক কেন্দ্র ছেড়ে চলে এল গোপালনগরে।

সতীশ মিত্তিরকে হত্যা করবার চেষ্টায় অভিযোগে অভিযুক্ত গোবর্ধনও হাজত থেকে এসেছিল পালিয়ে।

সংবাদ পাওয়া গেল না শুধু করিম আর শশীতারার। শেরযারের মতো তাদের দেখা গিছল বোম্বায়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে। ব্রিটিশ সৈনিকের উদ্যত বন্দুকের সামনে।

কৃষকদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরমে উঠলো।

কালাচাঁদ সর্বস্ব হারালেন। তাঁর জাতি, ব্রাহ্মণদেরও লাঞ্ছনার শেষ রইল না।

গোবর্ধন তাঁকে বললে, তোমার সমস্ত সম্পত্তি জাতীয় সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। বুঝলে ঠাকুর?

কালাচাঁদ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন ক্রোধে। বললেন, অত বড়ো মুখ নয়, অত বড়ো কথা? আমি পুলিশকেস করব।

গোবর্ধন অট্টহাস্য করে উঠলো। বললে, পুলিশ কোথা যে কেস করবে? আমরাই এখন পুলিশ। অত হৈ হৈ না করে চুপ করে থাকো। তোমার ভাগ্যি ভালো যে তুমি এখনো প্রাণে বেঁচে আছ।

কেন? আমায় খুন করবে?—কাপুরুষ কালাচাঁদ সর্বস্ব হারানোর আশঙ্কায় সহসা মরিয়া হয়ে উঠলো।

—তোমার কিছুই করব না। কারণ তুমি গৌরীর বাবা। নাহলে তুমি তো দূরের কথা এতক্ষণ তোমার বাড়ী ঘরেরও চিহ্ন থাকত না।

ভয়ে কালাচাঁদের দুই চোখ কুঁচকে গেল।

গোবর্ধন এক প্রচণ্ড ধমক দিলে, তোমাকে এবার সোজা করব কালোবাবু! সারাজীবন তুমি বেইমানী আর নিমকহারামী করে আসছ। এবার চাকা ঘুরেছে। তোমার দেনা সুদ সমেত শোধ করব। মানুষকে ভিটে-মাটি ছাড়া করে, তাদের সংসার ছারেখারে দিয়ে তুমি কি ভেবেছ পার পেয়ে যাবে?

কালাচাঁদেয় মুখ শুকিয়ে গেল। গোবর্ধনের জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে চেয়ে তিনি কথা কইতে পারলেন না। তাঁর কিন্তু কোন আশাও আর ছিলো না। গ্রামে পুলিসও নেই, আদালতও নেই।

তাঁকে বাঁচালে কৃষ্ণা। মৃদুকণ্ঠে সে বললে, আপনাকে আমার কথামতো চলতে হবে!

—যদি না চলি?—ভীত ও চকিত কালাচাঁদ একবার শেষ চেষ্টা করলেম নিজের অবশিষ্ট আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখবার জন্য।

—কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব!—গোবর্ধন গর্জন করে উঠলো।

ভয়ে কেঁচো হয়ে গেলেন কালাচাঁদ।

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর এবার দৃঢ় হয়ে উঠলো, আপনার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকবে না।

সেই কঠিন কণ্ঠস্বর একেবারে কালাচাঁদের মর্মে গিয়ে বিঁধলো। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে কে যেন বিছিয়ে দিলে ধূসর কুয়াশার আস্তরণ। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক গেল কালো হয়ে। তাঁর কিছুই থাকবে না? সমস্ত সঞ্চয় এরা কেড়ে নেবে? গৌরীকান্ত তো গেছেই, সারা জীবন ধরে

জমানো অর্থ, ছলে বলে ও কৌশলে গড়ে তোলা ঐশ্বর্য সে সবও যাবে ?

তিনি যেন রিক্ত হয়ে গেলেন। অন্তর ভরে উঠলো শূন্যতায়। মাথার ভিতর কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। গৌরীকান্তের দেওয়া আঘাত সহ্য হয়েছে। কিন্তু এই আঘাত ?

আজীবনের সঞ্চয়! লোলুপ আগ্রহে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন মনে স্থান না দিয়ে, নীতি ও দুর্নীতির বিচার না করে, মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন! এই সংগ্রহ আর সঞ্চয়ই যে তাঁকে গৌরীকান্তের দেওয়া দুঃখ ভুলিয়ে রেখেছিল! এর সবই যাবে ?

তাঁর চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠলো উদ্‌ভ্রান্ত ও অর্থহীন। হঠাৎ তাঁর অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠলো গৌরীকান্তের জন্য। মনে হল সব যাক! সব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। যদি গৌরী ফিরে আসে তার কাছে! কথাটা কিন্তু তিনি প্রকাশ করতে পারলেন না।

কৃষ্ণা ভাবছিল অন্য কথা।

বিদ্বেষ যেখানে পুঞ্জীভূত এবং সেই বিদ্বেষ প্রকাশের স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ নয়, সেখানে তার অসংযত প্রকাশ যে বর্বরতাকে অতিক্রম করে যাবে তার কার আশ্চর্য কি ? কালাচাঁদের প্রতি গোবর্ধনের রূঢ় ব্যবহার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আরো বহু সংবাদ সে পেয়েছে। যত সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কাহিনী।

গোপালনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ সতীশ মিত্তিরকেও কারা জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে।

গোপালনগরের প্রত্যেকটি কৃষকের মনে ছিলো সতীশ মিত্তিরের প্রতি একটা বিজাতীয় ক্রোধ। তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন কেউ তাদের মধ্যে ছিলো না। সে কথা তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এই পাশবিক কার্যের অনুষ্ঠানের জন্য সে মনে মনে পীড়িত হতে লাগলো।

কালাচাঁদ চলে যাওয়ার পর গোবর্ধনকে সে বললে, প্রতিশোধ নেওয়া চলবে না দাদু। আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি ওই প্রবৃত্তিকে।

কৃষ্ণার কথার কোন উত্তর দিলে না গোবর্ধন। আজকাল কৃষ্ণার সঙ্গে তর্ক করতে তার সাহস হয় না। হঠাৎ তার চোখে কৃষ্ণা উঠে গেছে অনেক উঁচুতে।

কিন্তু কৃষ্ণা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলে তার কথায় গোবর্ধন সন্তুষ্ট হয়নি।

নিরুত্তরে সে ধীরে ধীরে চলে গেল।

কৃষ্ণা রইল বসে। অনেক স্বপ্ন তার আছে। আছে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা। যে কৃষকদের মধ্যে সে এতদিন কাজ করেছে তাদের মানুষ করে তুলতে হবে তাকে। ধীরে ধীরে তাদের গড়ে নিতে হবে, যাদের মনুষ্যত্ব বহুকাল আগে তলিয়ে গেছে অধঃপতনের গভীর গহ্বরে।

বিকাশ তাকে গড়ার কাজ করবার শিক্ষাই দিয়েছে। ভারতবর্ষের মহা-জাগরণের এই মুহূর্তে সেই মহৎ সৃষ্টির ভিত্তিই স্থাপন করতে হবে।

কৃষকদের সে বুঝতে পারে। যারা তাদের নির্যাতন করছে তাদের ওপর তারা নিতে চায় নির্মম প্রতিশোধ। তাদের অন্তরে প্রতিহিংসার বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছে সর্বক্ষণ। কিন্তু তাদের সংযত করতে হবে। প্রবৃত্তির লাগাম যদি একবার ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে যে সীমাহীন বিদ্বেষ মনের অন্ধকার গহ্বর থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে আসবে বেরিয়ে, তার প্রতিক্রিয়া এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের অবতারণা করবে।

তাদের মন থেকে এই প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটন করে ফেলতে হবে। তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এক মহত্তর সম্ভাবনার দিকে। তারা যতক্ষণ না আত্মসচেতন হয়ে ওঠে ততক্ষণ তার সাধনা সার্থক হবে না।

গৌরীকান্তের সঙ্গে তার এই নিয়ে আলোচনা হয়।

সে যতক্ষণ কথা বলে গৌরীকান্ত তার দিকে চেয়ে থাকে তন্ময় হয়ে। এই তন্ময়তা কৃষ্ণার ভালোও লাগে। আবার সময় সময় মনে হয় কি এক অব্যক্ত কথা গুমরে গুমরে উঠছে গৌরীকান্তের অন্তরে। প্রকাশের ব্যথায় সেই কথা কঠিন একটা নাগপাশের বন্ধনে হচ্ছে জর্জরিত, কিন্তু কৃষ্ণা এখানে অসহায়।

গৌরীকান্ত কাজ করে চলেছে অবিশ্রাম। তার শ্রান্তি ক্লান্তি নেই। ব্যর্থতাকে সে গ্রাহ্যও করে না। শ্রমিক কেন্দ্র থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এসে তাকে ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায়নি। তার এতদিনের পরিশ্রম বৃথা হয়েছে, সেজন্য তার সামান্যতম চিত্তবিক্ষোভও নেই। তথাকথিত "ফ্যাসিষ্ট" বিরোধিদের কবলে পড়ে শ্রমিকরা যে কি অমার্জনীয় ভুল করে বসল সেই কথাই সে সময় সময় সখেদে করে প্রকাশ। "জনযুদ্ধ" ওয়ালাদের চক্রান্তে পড়ে শোষিত সমাজের বিরাট একটা শ্রেণী নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল, সেই দুঃখ তার সীমাহীন।

কিন্তু সে হতাশ হয়ে পড়েনি। জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নকে সে রূপ দিচ্ছে স্পন্দিত হৃদয় আর মথিত অন্তর নিয়ে। শান্ত সমুদ্রের মতো তার অপার মৌনতা আত্মার গভীরতাকে করছে প্রকাশ।

কৃষ্ণা জানে গৌরীকান্তের অবিচল আদর্শনিষ্ঠা আর অনলস কর্মপ্রচেষ্টা তার ভিতরের আর একটী মানুষকে চাপা দিয়ে রেখেছে। তাকে কথা কইতে দিচ্ছে না। এমন কি সেই মানুষটি আর কোনদিন কথা কইতে পারবে কিনা তাতেও তার সন্দেহ আছে। হয়ত সেজন্য সে নিজেও কিছু পরিমাণে দায়ী। কিন্তু সে জানে যে তার নিজের কোন অপরাধই নেই। সে নির্দোষ। তবুও যদি দায়িত্বের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় তো সে দায়িত্বকে সে বরণ করেই নেবে।

কৃষ্ণার এই জানাও অর্থহীন। খুব বেশীক্ষণ গৌরীকান্তকে তার মনে থাকে না। তার স্মরণের দুই কূল আলোড়িত করে বিকাশ। তরঙ্গের

পর তরঙ্গে জেগে ওঠে ফেণপুঞ্জ। সেই রূপকথার রাজপুত্র তার অন্তরকে রেখেছে রঙীন করে। গৌরীকান্ত সেখানে অনাহূত। আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করে কখনো কখনো সে হয়তো চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে চাঞ্চল্য ক্ষণস্থায়ী। সেজন্য গৌরীকান্তের প্রতি সহানুভূতি তার কম নয়!

তার আনন্দ ও বেদনার উৎসমুখে বিকাশের অমলিন প্রভাব। মৃত্যুর সীমান্ত থেকে সে তাকে দুহাত ধরে তুলে এনে স্থান দিয়েছে জীবনের মহাদেশে। সে অবিস্মরণীয়।

গৌরীকান্তের প্রতি অবিচার সে করেনি। তাকে উপেক্ষাও করেনি। তার প্রতি সহজ, সুন্দর ও শোভন আচরণই করেছে।

ইংরেজ খুব শীঘ্রই নিজের অবস্থা উপলব্ধি করলে।

নতুন যোগাযোগ পথ তৈরী করে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এসে শিবির স্থাপন করলে গোপালনগরের উপকণ্ঠে। তারা এল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, সমতালে পদক্ষেপ করতে করতে।

তাদের সামনে দাঁড়াবার শক্তি কৃষকদের ছিলো না। তবু তাদের ঢোল আর নাকাড়া বাজতে লাগলো। মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগলো মুহুর্মুহুঃ "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!"

বহুদিনের অবসাদ আর জড়ত্ব পরিহার করে তারা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। মৃত্যুভয় তাদের নেই। তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব যেন কিসের খোঁচা খেয়ে উঠেছে জেগে। তারা শিখছে নতুন ভাবে চিন্তা করতে।

জীবনের সীমাবদ্ধ পরিধি অতিক্রম করে তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে বিরাট বিশ্বে। রিক্ত ও বঞ্চিত অন্তর অভিনব এক প্রাপ্তির উল্লাসে হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ। এই বিশ্বাস তাদের দৃঢ় হয়ে উঠছে যে নতুন দিন আসছে। এতদিন যে ভাবে চলেছে সেই ভাবে আর চলবে না।

কৃষ্ণা তাদের বললে, তোমরা হয়তো কেউ বেঁচে থাকবে না। কিন্তু

তোমাদের মৃত্যু সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের শোষণ থেকে মুক্ত করবে। বঞ্চনা থেকে দেবে অব্যাহতি। জীবন উৎসর্গ করে তোমরা এক নবজীবনের দীক্ষায় দীক্ষিত করে যাবে দেশকে। বলো, তোমরা কি চাও? মুমূর্ষুর মতো এইভাবে বেঁচে থাকতে, না মৃত্যুবরণ করে দেশকে মুক্তিমন্ত্রে মাতিয়ে তুলতে?

—মৃত্যু! মৃত্যু চাই।—সহস্র কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠলো।

—সামনে দুর্ভিক্ষ।—কৃষ্ণার কণ্ঠ করুণ হয়ে উঠলো, যদি এখান থেকে কেউ চলে যেতে চাও তো যেতে পারো। কিন্তু তাতেও বোধহয় বাঁচতে পারবে না। না খেতে পেয়ে তিল তিল করে শুকিয়ে মরতে হবে। তার চেয়ে এই আত্মবিসর্জন শতগুণে শ্রেয়।

—আমরা আত্মবিসর্জনই করব!—মিলিত কণ্ঠের উত্তর মেঘমন্দ্রের মতো গম্ভীর হয়ে উঠলো।

তাদের দেখে আর হিংস্র বলে মনে হয় না। যে দুঃশাসন তাদের অমানুষ করে তুলেছিল তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টি হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ। তাদের চিত্তবৃত্তির তারে আঘাত করে কৃষ্ণা জাগিয়েছে এক অপরূপ মূর্চ্ছনা। যে মনোবৃত্তি নিয়ে তারা সতীশ মিত্তিরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল, থানা আর আদালত জ্বালিয়েছিলো, সেই মনোবৃত্তি হয়েছে রূপান্তরিত।

তাদের রুক্ষ, কর্কশ ও নির্বিকার মুখের দিকে চাইলে সে কথা উপলব্ধি করা যায়।

কৃষ্ণার সংক্ষিপ্ত আদেশ তারা শুনলে কান পেতে। সে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, যদি আত্মবিসর্জন করতেই চাও তবে অগ্রসর হও। হাজারে হাজারে চতুর্দিক থেকে সম্মুখীন হও ইংরেজ সৈনিকদের। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, তোমাদের নেই! সেজন্য দ্বিধা করো না! তোমাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করো!

হাজার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হল, ভারত ছাড়ো।—অটল আত্মবিশ্বাসে আর অবিচল দৃঢ়তায় তাদের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো।

তারা অগ্রসর হল।

তাদের পুরোভাগে গৌরীকান্ত। সে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে চাইলে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো এক ভাষাহীন নীরব বাণী।

সেদিকে চেয়ে ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হয়ে গেল কৃষ্ণা। তার বুকের ভিতর তোলপাড় করে উঠছিল। দুই চোখ বয়ে নেমে এল অশ্রুধারা। সেই অশ্রুধারার দিকে চেয়ে গৌরীকান্তের মুখে ফুটে উঠলো প্রশান্তির মৃদু হাসি।

সমুদ্রগর্জনের মতো আবার ধ্বনিত হল: ভারত ছাড়ো!

ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করে কৃষক জনতা এগিয়ে আসতে লাগলো। সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে হাজার হাজার লোক অগ্রসর হয়ে এল নির্ভীক ও অকম্পিত পদে। তাদের হাতে জাতীয় পতাকা। কণ্ঠে একটিমাত্র ধ্বনি: ভারত ছাড়ো।

সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক মেজর হোয়াইট এই দৃশ্য দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বন্দুকের গুলির মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল কঠিন আদেশ, ফায়ার!

সৈনিকদের হাতে আমেরিকার তৈরী ম্যাগাজিন রাইফেল গর্জন করে উঠলো। অগ্নিবর্ষণ করলে মেসিনগান। বহুলোক মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

প্রথমেই যে পড়ল সে গৌরীকান্ত।

মৃত্যুর তাণ্ডবে সৃষ্টি উঠলো সঙ্কুচিত আর ত্রস্ত হয়ে। গোপালনগরের শ্যাম-সবুজ দূর্বাদলের ওপরে কৃষকেরা পড়তে লাগলো লুটিয়ে লুটিয়ে।

তাদের শেষনিশ্বাসের শীতল স্পর্শ অনুভব করলে মৃত্তিকা নিজের

নীরব ও নির্বিকার বুকে। রক্তাক্ত দেহগুলি মাটির বুকেই পেলে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। যে মাটি তারা কর্ষণ করত। দুঃখে ও দুর্দিনে যে মাটি ছিলো তাদের অবলম্বন।

নিঃশব্দ বেদনায় স্পন্দিত হয়ে উঠলো পৃথিবী।

পনেরো

অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকারে জেগে রইল গোপালনগর মৃতদেহে আকীর্ণ হয়ে। বিদ্রোহ দমন করে বীর সৈনিকেরা এবার মেতে উঠেছে কদর্য লালসার নেশায়। চতুর্দিকের অখণ্ড নির্জনতা ভেদ করে ধ্বনিত হয়ে উঠছে ধর্ষিতা কৃষক-রমণীদের আর্তনাদ।

সেই বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে উঠলো টর্চের একঝলক তীব্র আলো। সেই আলোতে শবদেহগুলি নিরীক্ষণ করে দেখছিল বিকাশ আর সুখেন্দু।

বিকাশের মুখ ভাবলেশহীন। তার মনের মধ্যে কি ভাবের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠছে মুখ দেখে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুখেন্দুর দৃষ্টিতে কিন্তু প্রচ্ছন্ন ক্ষোভের অভিব্যক্তি।

অজস্র বারিধারা তাদের সর্বাঙ্গে সূচের মতো বিঁধছিল। বজ্রের গর্জনে কেঁপে উঠছিল পৃথিবী। যেন পাপ আর অন্যায়ের উদ্ধত ভ্রূকুটীর সম্মুখে কালান্তক মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে রুদ্র। তিমিরলিপ্ত তামসিকতাকে ধ্বংস করবার জন্য বিদ্যুতের সমুজ্জ্বল প্রভায় তার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘময় জটা উঠছে দুলে।

সুখেন্দুর কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনালো, এদের হাতে যদি হাতিয়ার থাকত।

যাকে লক্ষ করে কথাগুলো বলা হল, সে বোধ হয় কিছু শুনতে পেলে না।

—তুই কথা কইবি না বিকাশ?—সুখেন্দু বললে।

—কথা কইতে পারছি না!—বিকাশ বললে, ওরা স্তব্ধ হয়ে থেকে আমার চেয়ে ভালোভাবে তোর কথার উত্তর দিতে পারবে। অমন স্পষ্ট

আর প্রাঞ্জল উত্তর আমি দিতে পারবো না। সে মৃতদেহগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—হেঁয়ালি রেখে দে!—সুখেন্দুর কণ্ঠ তিক্ত হয়ে উঠলো, বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের মহাঅভ্যুত্থান সার্থক হল না। কিন্তু এর দায়িত্ব নেবে কে? সাতারা, বালিয়া, রামনাদ, মেদিনীপুর রচনা করেছে ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের রক্তাক্ত অক্ষরগুলিতে কাদের ভুল ত্রুটি তিরস্কারের মতো থাকবে জেগে?

বিকাশ ভ্রূকুটী করলে।

সুখেন্দু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলে না। নিরুদ্ধ আগ্নেযগিরির ধূমায়মান গর্ভ থেকে তরল অগ্নিস্রোত বেরিযে আসতে লাগলো, নেতারা ঘটা করে জেলে গেলেন "কুইট্ ইণ্ডিয়া" প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু "কুইট" করাবার দায়িত্ব যাদের ওপর পড়ল তাদের সংগঠিত করাই হয়নি এতদিন। বহু-বিখ্যাত নেতাবা শুধু সভা করেছেন আর প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। আরো একটি মহৎ কাজ করেছেন এই যে আমাদের মতো যে সব কর্মী জনসাধারণের মধ্যে কিছু কাজ করবার চেষ্টা করেছে তাদের প্রাণপণে দিয়েছেন বাধা। তার পরিণাম আজ চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ?

—তুই বড় উত্তেজিত হযেছিস।—বিকাশ বললে।

—স্তূপীকৃত শবদেহগুলোর দিকে চেয়ে আমি স্থির হয়ে থাকতে পারছি না। "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাবের মূলে এরা। নেতাদের সিংহাসন এরাই টলিয়েছিল। আরো বিলম্ব হলে হয়তো এরা নেতৃত্বের সম্মানও রাখত না। তাঁরা সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কাগজে কলমে ইংরেজ তাড়িয়ে সমারোহ করে গেলেন জেলে।

বিকাশের কণ্ঠ এবার কঠিন হয়ে উঠলো, তুই চুপ কর, না হলে পাগল হয়ে যাবি!

—ভয় নেই। পাগল হব না।—সুখেন্দু বললে, হলে কিন্তু ভালোই হত। দিনের পর দিন আত্মগোপন করে ঘুরে বেড়িয়েছি এক দেশ থেকে আর এক দেশে। পুলিশ কুকুরের মতো দিনরাত পিছনে তাড়া করে ফিরেছে। মাথার ওপরে ফাঁসীর দড়ি উঠেছে দুলে। তবু সে সব গ্রাহ্য করিনি। জনসাধারণের কাছে গেছি ছুটে। মিতালী করে তাদের কানে কানে শুনিয়েছি কতো অসম্ভব কথা। আজ তার পরিণতি দেখে পাগল হতে পারলে আর কিছু না হোক শান্তি হয়তো পেতুম।

এতক্ষণ পরে বিকাশ হাসলে। অস্বাভাবিক হাসি। বললে, এখানে দাঁড়িয়ে এই প্রসঙ্গের আলোচনা আজ ভালো লাগছে না সুখেন্দু! ভারতবর্ষে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্ন আমরা দেখছি বহুদিন ধরে। তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করেছি। উনিশ শো আটাশ সালে পার্ক-সার্কাসের মাঠে কংগ্রেসের অধিবেশনে আমরা যে শপথ গ্রহণ করেছিলুম তার মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করেছি কায়মনোপ্রাণে। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন সেই পবিত্র অঙ্গীকার আমাদের আবদ্ধ করে রাখবে, আর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করবার জন্যই আমরা জীবনধারণ করব। ব্যর্থতার অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে সেকথা আজ আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। লক্ষস্থলের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের একমাত্র নীতি। এই নীতিকে আমাদের পালন করতেই হবে। এর মধ্যে নেতাদের সমালোচনা করে আমরা যেমন সময় নষ্ট করব না, তেমনি নিরাশায় ভেঙে পড়ে আদর্শও বিসর্জন দোব না।

—তোমার নীতি নিয়েই তুমি থাকো। আমি কিন্তু ওসব পারব না। ভণ্ডামী দেখলেই আমার দেহ জ্বালা করে ওঠে। অহিংস অসহযোগ করে জেল খেটে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফিরে এসে যারা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার কিংবা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হয়ে বসল কিংবা পেলে আরও উঁচু গদি তাদের স্বদেশ-প্রেমের একচেটে

কারবার আমার কাছে কিছুতেই স্বীকৃতি আদায় করতে পারবে না। সুবিধা পেলেই আমি তাদের চাবুক মারবো। তাতে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ হয় হবে।

—তা হোক। কিন্তু যে পথে আমরা পদক্ষেপ করেছি চরম দুর্ভাগ্যের দিনেও যেন সেই পথে সমতালে পা ফেলে চলতে পারি।—বিকাশের কণ্ঠ আবেগে গাঢ় হয়ে এল।

সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকারে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে তারা দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের পিছনে এক দল কুকুর সুরু করলে বীভৎস কলরব। কতকগুলো শিয়াল এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

আর মূক ধরিত্রীর বুকে কৃষকদের মৃতদেহগুলো জলে ভিজে ফুলে উঠছিল। মৃত্তিকার ওপর যে জন্মগত অধিকার তাদের ছিলো সেই অধিকার তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে-চরম বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে।

পৃথিবীর হৃৎস্পন্দন যেন দুর্নিবার হয়ে উঠলো।

একটি কুটীরে কৃষ্ণা বসেছিল স্তব্ধ হয়ে। বিধ্বস্ত জীবনধারা এই রাত্রিকে তার কাছে ভয়াবহ করে তুলেছে। হত্যার পাশবিক উল্লাস আর ধর্ষিতা রমণীদের মর্মভেদী আর্তনাদ তার স্নায়ুমণ্ডলীকে যেন অবশ করে দিয়েছে।

গৌরীকান্ত, গোবর্ধন, কৃত্তিবাস কেউ বেঁচে নেই। আরো কত লোক মরেছে।

গৌরীকান্তকে তার মনে পড়ছে। ধীর, স্থির ও আদর্শবাদী তরুণ। সাহস করে সে অনুরাগের কথা কৃষ্ণার কাছে প্রকাশ করতে পারলে না কখনো। তার নির্লোভ ও নির্ভীক অন্তরে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখলে সেই অনুরাগ মূল্যবান ঐশ্বর্যের মতো। পিতার সম্পদের মোহ, নিরাপদে

দিন কাটানোর নিশ্চিন্ত আরাম সব কিছু পরিত্যাগ করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্মক্ষেত্রে। বেছে নিলে আত্মগোপনের বিড়ম্বনাময় জীবন। অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রমিককেন্দ্রগুলিতে কাজ করে শেষে বিপথগামী শ্রমিকদের কাছ থেকে ফিরে এল রিক্ত হস্তে। তবু হতাশ হল না। কৃষকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলে। যে কৃষকেরা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে তার পিতাকে লাঞ্ছিত করেছে, করেছে সর্বস্ব লুণ্ঠন, সেই কৃষকেরা হল তার সাথী! উদার ও বলিষ্ঠ, অদম্য ও নির্ভীক সেই মানুষটির মূল্যবান জীবনের অকাল-সমাপ্তির জন্য কি সেই দায়ী ?

কৃষ্ণার চোখের সামনে ফুটে উঠলো গৌরীকান্তের চোখের ভাষাহীন নীরব বাণী। অযোগ্যের প্রতি একি তার অসীম করুণা ? একি নিষ্ফল আর ব্যর্থ প্রেম ? কৃষক জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যে দৃষ্টিতে সে কৃষ্ণার দিকে চেয়েছিল সেই দৃষ্টি যেন তার সর্বাঙ্গে সূচের মতো বিঁধছে। কঠিন একটা তিরস্কার জ্বল জ্বল করে উঠছে আর সে ভেঙে পড়ছে কান্নায়। গৌরীকান্তের মতো লোক তার মতো হতভাগিনীকে কেন ভালোবাসলে ?

আর তার মনে পড়ছে গোবর্ধনকে। কঠিন, সরল ও নির্বোধ সেই বৃদ্ধটি যে তার কত আপনার ছিলো সেকথা সে উপলব্ধি করছে।

কৃত্তিবাসকেও মনে পড়ছে।

নিরাপদে দিন কাটানোর মোহে প্রলুব্ধ হয়ে আর শশীতারাকে নিয়ে অবশিষ্ট জীবন স্বচ্ছন্দে যাপন করবার আশায় সে বিশ্বাসঘাতকতা অবধি করেছিল। কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তও সে করলে। তার বড় আদরের মেয়ে শশীতারা! সেই শশীতারা ছুটলো পৃথিবীনাথের সঙ্গে বোম্বায়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে উদ্যত বন্দুক আর বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিতে। সেও স্থির হয়ে থাকতে পারলে না। মিলের কাজ ছেড়ে দিয়ে ছুটে এল গৌরীকান্তের সঙ্গে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য।

দুর্বলচিত্ত কৃত্তিবাস।

তার ক্ষোভ চরমে উঠছে ধর্ষিতা নারীদের কথা ভেবে। একপাল উন্মাদ পশুকে যারা এই অসহায়া নারীদের পিছনে ছেড়ে দিলে, গুহার অন্তরাল থেকে হিংস্র রক্তলোলুপদের যারা বার করে নিয়ে এল তাদের সে কি নামে অভিহিত করবে?

তার মনে হতে লাগলো এই অন্ধকার ও বর্ষণমুখর রাত্রি পৃথিবীর ওপরে টেনে দিয়েছে মৃত্যুর নিঃশব্দ আবরণ। সেখানে আশা নেই, আনন্দ নেই, নেই সমুজ্জল কোন সম্ভাবনা। নরকের উন্মুক্ত দ্বার অতিক্রম করে দলের পর দল প্রেত প্রবেশ করছে সেথা। যা কিছু মধুর, মনোহর আর বিচিত্র, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে তার সব। উল্লাস ও উৎসাহের চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখছে না।

হঠাৎ তার চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। বিকাশের মৃদু কণ্ঠ সে শুনতে পেলে, কৃষ্ণা?

ঘরের মধ্যে সে লাফিয়ে উঠলো। এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব তার অসহিষ্ণু মুহূর্তগুলির গতি যেন স্তব্ধ করে দিলে। ছুটে গিয়ে সে দরজা খুলে দিলে। সিক্ত বস্ত্রে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলো বিকাশ।

কেরোসিনের অনুজ্জ্বল আলোয় কৃষ্ণা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে বিকাশের দিকে। রিক্ততা আর কখনো এতখানি করুণ হয়ে তার চোখের সামনে ফুঠে ওঠেনি। বিকাশের বিবর্ণ মুখে পরাজয়ের কালি ফুটে উঠেছে কলঙ্ক চিহ্নের মতো।

তার রূপকথার রাজপুত্র বিকাশ।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বলাল, তোমার কি অসুখ করেছে বিকাশদা?

বিকাশও তার দিকে চেয়েছিল। সে হাসলে। সেই হাসি যেন প্রাণহীন। বললে, না। অসুখ করেনি।

তার কথা কৃষ্ণার বিশ্বাস হল না। সে বললে, তবে তোমার কি হয়েছে ?

—আমি বড় পরিশ্রান্ত কৃষ্ণা।—বিকাশ বললে, আমার দেহ আর আর বইছে না।

নিজের সৃষ্টির ব্যর্থতার সামনে ঈশ্বরও বোধ করি এমনি বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। কৃষ্ণা তার নিজের দুঃখের কথা ভুলে গেল। সমবেদনায় কাতর হয়ে উঠলো তার মন। বললে, চা করব বিকাশদা ?

—না। চা খাওয়ার সময় হবে না। আমরা এখনি বেরোব!—বিকাশ বললে।

—কোথা ?—কৃষ্ণা বিস্মিত হল।

—জায়গার অভাব কি ? বৃহৎ পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যেতে পারি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কৃষ্ণা বললে, গোপালনগর ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

—কেন ? তোমাকে বেঁধে রাখবার মতো গোপালনগরের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে নাকি ?

কৃষ্ণা লক্ষ করলে বিকাশ বড় বেশী কাঁপছে। সে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, আমার বিবেচনা দেখেছ ? তোমাকে ছাড়বার কাপড় পর্যন্ত দিইনি।—তাড়াতাড়ি সে একখানা শাড়ী টেনে নিলে ঘরের এক কোণ থেকে।

—কাপড় দরকার নেই।—অসহিষ্ণু কণ্ঠে বিকাশ বললে, তুমি তৈরী হয়ে নাও।

—আমি যাবো না বিকাশদা।—নতমুখে কৃষ্ণা বললে।

—কারণ কি ?—বিস্মিত বিকাশ প্রশ্ন করলে।

—এই হাহাকার আর আর্তনাদের মাঝখান থেকে আমি পালিয়ে যেতে পারবো না।—কৃষ্ণার কণ্ঠে স্পষ্ট হয়ে উঠলো প্রতিবাদ।

—কি করবে এখানে থেকে ?

—কিছু না করতে পারি তো মরব? যেমন করে গৌরীকান্ত মরেছে, দাদু মরেছে, কৃত্তিবাস মরেছে? মরেছে আর সব চাষীরা?

—সেভাবে, মরে লাভ কি?

—লাভ লোকসানের হিসাব করতে আজ বসিনি বিকাশদা! সহজ চোখে যে সব ঘটনা ঘটতে দেখেছি তাতে আমার জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেছে।

—এসেছে?—বিকাশ বিদ্রূপ করলে কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

—সত্যি বিকাশদা, গোপালনগরে আজ মুমূর্ষুর আর্তনাদ আর অপমানিতা মেয়েদের হাহাকার ছাড়া আর কিছু নেই। সেই আর্তনাদ আর হাহাকারই আমার কানে বাজছে। আর কোন কথা ভাববার শক্তি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে।

—হাহাকার আর আর্তনাদ তোমার কানে বাজছে?—গম্ভীর কণ্ঠে বিকাশ বললে, আর আমার কি হয়েছে জানো? আমার চোখের সামনে আজ চোদ্দ বছরের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমার হাতে-গড়া সংগঠন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অনাহার, অনিদ্রা, প্রাণপণ পরিশ্রম সব বৃথা হল। তবু নিজের সৃষ্টির ধ্বংসস্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে আমার জীবনে এখনো বিতৃষ্ণা এল না কৃষ্ণা!

—তোমার সঙ্গে আমার তুলনা?—কৃষ্ণা ম্লান হাসলে।

—কারো সঙ্গে কারো তুলনা নয়, যে বেদনার গুরুভারে আমরা হাঁফিয়ে উঠেছি তাকে অপসারিত করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমরা কতখানি নুয়ে পড়েছি তার হিসাব করতে বসে কতখানি অগ্রসর হয়েছি সে কথাও চিন্তা করতে হবে। মাটি অধিকারের লড়াই সুরু হয়েছে কৃষ্ণা। কৃষক আর শ্রমিকের মাটি! সেই লড়াইয়ে নির্যাতন, লাঞ্ছনা বা অপমৃত্যু থাকবে না সে কেমন কথা? এই সমস্তকে অতিক্রম করেই তো আমাদের পথ চলতে হবে?

—সেইজন্যই তো আমার সারা দেহে আগুন জ্বলে উঠেছে। অপমান, লাঞ্ছনা আর অপমৃত্যুর প্রতিশোধ আমাকে নিতে হবে। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

—অসহ্যই যদি হয়ে থাকে তবে প্রতিশোধ নেওয়া কি তার প্রকৃষ্ট পথ ?—বিকাশের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠলো, না কৃষ্ণা, এর একমাত্র পথ প্রতিবিধান। যারা অপমানিত হল, লাঞ্ছিত হল, আর যারা মৃত্যুবরণ করলে তাদের ত্যাগস্বীকার যাতে সার্থক হয় তোমাকে সেই পথেই অগ্রসর হতে হবে। শোধ নিয়ে কি সান্ত্বনা তুমি পাবে ? আর কি শোধই বা নেবে ? বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেছে তার বহু কারণ আছে। সদা-সতর্ক, শক্তিমান শত্রু আমাদের প্রত্যেকটি দুর্বলতার আর ক্রটি বিচ্যুতির সুযোগ ভালোভাবেই নিয়েছে। একটিমাত্র কেন্দ্রের বিপর্যয় তোমাকে অভিভূত করে দিয়েছে কিন্তু আমি বহু কেন্দ্রের বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে আসছি। কোন কোন জায়গায় লড়াই এখনও চলছে। পরাজয় স্থির জেনেও তারা পিছু হটে আসেনি। যে বর্বরতার প্রকাশ সেই সব স্থানে দেখেছি তার তুলনায় এখানকার অত্যাচার অনেক কম। আমাদের সংগঠিত কতকগুলি কেন্দ্র এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছে তা জানো ? কৃষ্ণা শিউরে উঠলো, বোমা ফেলেছে ?

—হ্যাঁ। কত লোক মরেছে তার হিসাব নেই। শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ এমন কি গরু, ছাগল, কুকুর পর্যন্ত।

—আমার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি আলো দেখতে পাচ্ছি না বিকাশদা।

—আমি পাচ্ছি। আমার চোখ দিয়ে তুমি দেখ !– অকস্মাৎ বিকাশ যেন সজীব হয়ে উঠলো, সৃষ্টির আদিমতম দিনে এই পৃথিবীর মাটি যারা অধিকার করেছিল, মাটিকে ডেকেছিল মা বলে, মাটির স্নেহরসে পুষ্ট হয়েছিল, তারপর শাসনে, শোষণে আর নিষ্পেষণে যাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত

নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হল তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। বোমা আর মেশিনগান সেই চেতনাকে পিষে ফেলতে পারবে না। সেই চৈতন্য আজ দিকে দিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে। কৃষক আর শ্রমিকেরাই হবে এই পৃথিবীর মালিক। তাদের পরিশ্রমে সৃষ্টি হয়ে উঠবে শোভাময়। অনাগত সেই অরুণোদয়ের দিনটির উদ্বোধন বিয়াল্লিশ সালের আগষ্ট বিপ্লবই করে রাখলে। বুঝতে পারছ?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার সঙ্গে এস। ভারতের বঞ্চিত কৃষকেরা আছে তোমার প্রতীক্ষায়। "জনযুদ্ধে"র বুলি তাদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তাদের সদ্য-জাগ্রত চেতনা তোমার মনের সোনার কাঠির স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তাদের অন্তর।

বিকাশ একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে। তার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। কৃষ্ণা সেই দৃষ্টির দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অন্তরের অনুদ্ঘাটিত সত্য এমন করে তার চোখে আত্মপ্রকাশ করবে সেকথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। এতদিন যা ছিলো গোপন, ছিলো অন্তরালে, আজ এই ভয়াবহ দুর্দিনে সেই সযত্নসংরক্ষিত আনন্দ এমন করে আচম্বিতে প্রকাশিত হল কেন? এ আনন্দ যে অসহ্য।

অবর্ণনীয় এক অনুভূতি তাকে আত্মহারা করে দিলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। বিকাশের আকস্মিক আত্মপ্রকাশ একটা দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা বৈকি। ব্যর্থতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা, সে কথা সে আর বিকাশ দুজনেই জানে। আরো জানে প্রেম তাদের উভয়ের জীবনেই অর্থহীন। প্রেমের চেয়ে প্রতিশ্রুতিই তাদের কাছে বড়। প্রতিশ্রুতিকেই অবশ্য-পালনীয় বলে তারা গ্রহণ করেছে! আত্ম-কেন্দ্রিক জীবনের আনন্দ? সে আনন্দ আর যারা করে করুক তারা তার স্বপ্নজালে জড়িয়ে পড়বে না। সে জীবনের প্রতি তাদের লোভও নেই করুণাও নেই।

একটা নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তাদের প্রেরণা দিয়েছে বহুদিন আগে তাকে অস্বীকার করতে। সমষ্টির কাছে তারা করেছে আত্ম-সমর্পণ। সেই আত্ম-সমর্পনই তাদের সাধনা।

তবু বিকাশ কৃষ্ণার একখানা হাত ধরলে। বললে, ভারতবর্ষ পদক্ষেপ করছে। অন্ধকারকে করছে অতিক্রম। এই মহাজাগরণের মুহূর্তে চলো, আমরাও যাই। বলো, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"

মেঘার্ত আকাশ ক্ষণে ক্ষণে প্রদীপ্ত হয়ে উঠছিল বিদ্যুৎ শিখায়। কৃষ্ণার সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"

তারপর বর্ষণমুখর রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকারে তারা করলে পদক্ষেপ।